উপন্যাস

এর বাড়ি ওর বাড়ি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com
2021

সূচিপত্র

১. মানুষের মৃত্যুর সময়.....2
২. মায়ের চিঠি 7 5

১. মানুষের মৃত্যুর সময়

মানুষের মৃত্যুর সময় নাকি শৈশব ফিরে আসে? সিরাজুল চৌধুরী বলেন, তাহলে কি আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এল? রিপোর্ট এসে গেছে এর মধ্যে?

চোখ বুজলেই তিনি একটি বাচ্চা ছেলেকে দেখতে পাচ্ছেন। দশ-এগারো বছর বয়েস, ইজের পরা, খালি গা, ডান বাহুতে একটা তাগা বাঁধা। এই বালকটি কে? তিনি নিজেও একটু একটু চেনা লাগছে ঠিকই। তার ওই বয়সের কোনও ছবি নেই, তখনকার দিনে ছবি তোলার তেমন রেওয়াজছিল না। এখন পোলাপানদের হাতেও ক্যামেরা থাকে। সেই সময় ছবি তোলাতে হত দোকানে গিয়ে।

ছেলেটি একা সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে নেমে আসছে। বার বার ওই একই দৃশ্য। কীসের যেন ব্যস্ততা, হুড়মুড় করে নামছে। যে-কোনও মুহূর্তে আছাড় খেয়ে পড়তে পারে। এই দৃশ্যটা তিনি দেখছেন কেন? এর তাৎপর্য কী?

সিরাজুল চৌধুরী চোখ মেলে তাকালেন। নার্সিংহোমের কেবিন। সাদা ধপধপে দেয়াল। পায়ের দিকে একটা জানলা। সেই জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যায় না। মাঝখানে একটা পুকুর আছে। তার ও-পারে পাশাপাশি দুটি আকাশচুম্বী বাড়ি। আগে বলা হত স্কাইস্ক্র্যাপার, এখন বলা হয় মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং।

পেটজোড়া ব্যান্ডেজ, কিন্তু শরীরে বিশেষ ব্যথা-বেদনা বোধ নেই। একট ঘুম ঘুম ভাব আছে। সকালে হরলিক্স আর বিস্কুট দিয়েছিল, খেতে কোনও অসুবিধে হয়নি। তারপর খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আবার ঘুম এসে গেল। রাত্তিরে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল, দিনেরবেলাতেও তার জের থাকে।

ওই বালকটিকে দেখা মানে কি তিনি নিজের বাল্যকাল দেখছেন? এখুনি মরে যাবেন, এটা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। একটু খিদেখিদে পাচ্ছে। মৃত্যুর আগে কি মানুষের খিদে পায়? ক্ষুধা-তৃষ্ণাই তো বেঁচে থাকার লক্ষণ।

বিছানার পাশে একটা সুইচ আছে। সেটা টিপলেই নার্স আসে। হাত দিয়ে সুইচটা খুঁজতে লাগলেন, তার মধ্যেই এক জন নার্স ঘরে ঢুকল।

নার্সটির বয়স বছর পঁয়তিরিশের হবে, স্বাস্থ্য ভাল, মুখখানি কমনীয়। বেশ ফিটফাট পোশাক। নার্সদের একটু দেখতে ভাল হলে মনটা ভাল লাগে। সেদিক থেকে ঠিক আছে, কিন্তু এই নার্সটির ব্যবহার বড় যান্ত্রিক। গলার আওয়াজটাও কর্কশ। অনেকটা কাকাতুয়া পাখির মতো।

নার্সটি বলল, হাঁ করুন, আপনার টেম্পারেচার নেব!

সিরাজুল চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, আমি কেমন আছি?

নার্সটির ভুরু কুঁচকে গেল। বলল, কেমন আছেন, তা তো আপনিই ভাল জানবেন!

সিরাজুল চৌধুরী বললেন, আমার তো মনে হয়, আমি এখন বেশ ভালই আছি।

নার্সটি বলল, তাহলে ভালই আছেন। নিন, হা করুন!

সিরাজুল চৌধুরী এর পরেও জিজ্ঞেস করতে চাইছিলেন, আমি যদি ভাল থাকি, তাহলে আমি চোখ বুজে বার বার একটা বাচ্চা ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি কেন?

কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলেন, এমন একটা প্রশ্ন করলে ওর কাছে ধমক খেতে হবে।

মুখে থার্মোমিটার ঢোকানো থাকলে কথা বলা যায় না। নার্সটি বিছানা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। সিরাজুল তার শরীরের গড়ন ও রেখা দেখছেন। লোকে তাকে বুড়ো মানুষ মনে করে, চুল সব পেকে গেছে, কিন্তু শরীরের রসকষ এখনও শুকিয়ে যায়নি। এখনও

স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীলোকদের দেখলে মনটা চনমনে হয়। এত বড় একটা অপারেশন হয়েছে, এই অবস্থাতেও মেয়েটি কপালে হাত রাখলে মনে হয়, আরও খানিকক্ষণ রাখুক।

থার্মোমিটার তুলে নিয়ে নার্সটি বলল, সত্যিই তো ভাল আছেন। খুব তাড়াতাড়ি ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে।

সিরাজুল চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, আমার বাড়ির লোক আসেনি?

নটা তো বাজেনি। নটার আগে ভিজিটার্স নট অ্যালাউড।

এখন কটা বাজে? আটটা কুড়ি।

আমার একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে। চা পেতে পারি?

অবশ্যই পাবেন। আর কিছু চাই?

একটা আণ্ডা সেদ্ধ!

সেটা দিতে পারব না। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করতে হবে। কর্নফ্লেক্স খাবেন?

না। তাহলে শুধু চা। আপনার বাড়ি কোথায়?

পার্ক সার্কাসে। কেন বলুন তো?

আপনার বাবা, মানে আপনারা কি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ?

আমার বাবার বাড়ি ছিল টাঙ্গাইল, শুনেছি।

টাঙ্গাইল? কোথায় কোথায়? শহরে? না বাইরে? আমি টাঙ্গাইল খুব ভাল চিনি।

নার্সটি এ আলোচনায় কোনও উৎসাহ না দেখিয়ে বলল, আপনার প্রেসারটা একটু মাপতে হবে। তারপর দুটো ওষুধ।

সে কোনও রকম ব্যক্তিগত আলোচনায় যেতে রাজি নয়। এদের বুঝি এই রকমই ট্রেইনিং দেয়? সিরাজুল চৌধুরীর কথা বলার ইচ্ছা হচ্ছিল। এক-এক সময় মানুষের সাহচর্য, মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্য একটা ব্যাকুলতা জাগে। কিন্তু নার্সটি গম্ভীর ভাবে কাজ সেরে বেরিয়ে গেল।

মিন্টু কি আজই রিপোর্ট পাবে?

জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে রয়েছে ওই একটা রিপোর্ট। ঢাকায় তিন জন ডাক্তারই বলেছিল, ক্যানসার। অপারেশন ছাড়া গতি নেই। কিন্তু সিরাজুল রাজি হননি। মরতে যদি হয়, তাহলে শরীরটা কাটা-ছেঁড়া না করেই মরতে চান।

এ বছর ব্যথাটা খুব বেড়েছিল, তার শালা মিন্টু জোর করে নিয়ে এল কলকাতায়। মিন্টুর মায়ের অপারেশন করেছেন অংশুমান রায়, তার ওপর মিন্টুর খুব ভরসা। তা ভালভাবেই অপারেশন হয়ে গেছে কদিন আগে। এই ডাক্তার কিন্তু ক্যানসার সম্পর্কে নিশ্চিত নন। তিনি বলেছেন, এবারের বায়োপসি রিপোর্ট না দেখে কিছু বলা যাবেনা।

সেই রিপোর্টের জন্য অধীর প্রতীক্ষা। দারুণ সাসপেন্স। যেন কোনও এক বিচারক ফাঁসি দেবেন কি দেবেন না, সেই রায় দেবার জন্য চিন্তা করছেন।

যদি ক্যানসার হয়, তাহলে আর কতদিন আয়ু? বড় জোর ছ'মাস। তার পরেই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে?

সেই নার্সটি আর এল না, একজন আয়া এসে চা দিয়ে গেল।

মিন্টুরা ঠিক নটার সময়েই আসবে তো? দেরি করে বেরুলে রাস্তায় খুব জ্যাম হয়।

চায়ে দুবার চুমুক দিতে না-দিতেই সিরাজুল চৌধুরীর আবার ঘুম এসে গেল। আবার তিনি দেখতে পেলেন সেই বালকটিকে। সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড়িয়ে নামছে।

এটা কোন বাড়ির সিঁড়ি? রট আয়রনের রেলিং। মাঝখানটা ঘুরে গেছে। সিঁড়িগুলো লাল রঙের। সিঁড়ির নিচে দেখা যাচ্ছে একটা চৌকো উঠোন, একটু খুব বড় কাতলা মাছ, জ্যান্ত, লাফাচ্ছে সেই উঠোনে। এক জন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে পেছন ফিরে।

এটা কি স্বপ্ন, না ভুলে যাওয়া স্মৃতির এক ঝলক? ওই স্ত্রীলোকটি কে? সিঁড়ির বাঁক ঘুরতে গিয়েই বালকটির পা পিছলে গেল, পড়তে লাগল গড়িয়ে। সিরাজুল চৌধুরীর বুকটা ধক করে উঠল। ঠিক এ-রকমই তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। অত জোরে কেউ সিঁড়ি দিয়ে নামে? অতি দুরন্ত ছেলে! এবার মাথা ফাটবে। প্রাণে বাঁচবে তো?

যেন নিজেই যন্ত্রণা পাচ্ছেন, এইভাবে কঁকিয়ে উঠলেন তিনি।

তার পরই দৃশ্যটা মুছে গেল।

এর পরের ঘটনাটা তিনি দেখবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু দৃশ্যটা আর ফিরে এলনা। পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছু একটা স্বপ্ন দেখে হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে।

ঘুম ভাঙল ফিসফিসানি শুনে। চোখ মেলে দেখলেন, মিন্টু আর রেহানা এসে গেছে। একটা সুন্দর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, সুস্থ মানুষের গন্ধ। তাছাড়া রেহানা বোধহয় কোনও ভাল পারফিউম মেখে এসেছে। মিন্টুর ছোট মেয়ে রেহানা। বয়েস হল বাইশ না তেইশ? হালকা, স্নিগ্ধ নীল রঙের সালোয়ার কামিজ পরে আছে, মুখখানি যেন ফুলের মতো। দেখলে মনে হয়, অতি সরল, এখনও পৃথিবীর বিশেষ কিছুই জানে না। কিন্তু ও-মেয়ের বুদ্ধি খুব চোখা, জেনেটিকস নিয়ে এমএসসি পড়ছে।

তাকে চোখ মেলতে দেখে মিন্টু জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন দুলাভাই?

সিরাজুল চৌধুরী কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলেন যে, তিনি নার্সিংহোমে বিছানায় বন্দি হয়ে আছেন।

তাড়াতাড়ি উঠে বসার চেষ্টা করতেই পেটের ব্যান্ডেজে টান লাগল, ব্যথা বোধ হল। তবু তিনি বললেন, ভালই আছি, বেশ ক্ষুধা হচ্ছে।

রেহানা হাসিমুখে বলল, মুসাফির, ইউ লুক ফ্রেস! চলল, বেড়াতে যাই।

সিরাজুল চৌধুরী দৈনিক পত্রিকায় মুসাফির ছদ্মনামে নিয়মিত কলম লেখেন, তাই পরিবারের ছোটরা সবাই তাকে মুসাফির নামেই ডাকে। তার শুনতেও ভাল লাগে।

তিনি মিন্টুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রিপোর্ট পাওয়া গেল?

মিন্টু বলল, তিনটার সময় পাওয়া যাবে। আমার তো মনে হয়...।

এরপর কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা আসবে কি আসবেনা? তিনটে বাজতে আর কত দেরি?

.

০২.

মিউজিয়ামের পাশের রাস্তাটার নাম সদর স্ট্রিট। এক সময় এই রাস্তার একটি বাড়িতে দাদা বউদির সঙ্গে থাকতেন তরুণ রবীন্দ্রনাথ, এখানেই লিখেছিলেন তার বিখ্যাত কবিতা, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। তখন এখানকার দৃশ্য কী-রকম ছিল, এখন আর তা বোঝার উপায় নেই, এ রাস্তায় পর পর শুধু হোটেল।

বাংলাদেশ থেকে অনেকেই কলকাতায় এসে এই রাস্তার কোনও হোটেলে ওঠে। এখান থেকে নিউ মার্কেট খুব কাছে, কেনাকাটার সুবিধে হয়। শহরের যে-কোনও জায়গাতেই যাতায়াত সহজ।

নিয়মিত বাংলাদেশি খদ্দেরদের পেয়ে এখানকার দু'একটা ছোটখাটো হোটেল ফুলে-ফেঁপে বড় হয়ে গেছে। দোতলা হয়েছে চার তলা, লিফট বসেছে।

সিরাজুল চৌধুরী সাত বছর আগে কলকাতায় এসেছিলেন, তখন এই হোটেলটার চেহারা ছিল অতি সাধারণ। এখন রীতিমতো ঝলমলে ভাবে সাজানো। নতুন ঘরগুলির বাথরুম শ্বেত পাথরের।

বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিরাজুল চৌধুরী হাঁ করে নিজের দাঁত দেখছেন। তার ওপরের পাটির একটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। তিনি আপন মনে হাসলেন।

তার এই একটা দাঁত অনেক দিনই নেই। স্কুলে পড়ার সময় সহপাঠীরা তাকে ফোকলা বলে খেপাত। তখন তিনি গর্ব করে বলতেন, একদল গুণ্ডার সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে তার ওই দাঁত ভেঙে যায়। এটা অবশ্যই মিথ্যে কথা। তবে অনবরত ওই মিথ্যে কথাটা রোমহর্ষক ভাবে বর্ণনা করতে করতে সেটা তার নিজের কাছেই সত্যি হয়ে গিয়েছিল। আসল কারণটা ভুলেই গিয়েছিলেন।

সেটা মনে পড়ল এতকাল বাদে! সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতে গিয়ে আছাড় খেয়ে গড়িয়ে পড়েছিলেন একবার। মাথা ফেটেছিল, একটা দাঁত ছিটকে গিয়েছিল। গত কাল টেলিফোনে ঢাকায় বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি তার আম্মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আম্মার ঠিক মনে আছে, তিনিও সিঁড়ি দিয়ে পড়ে যাওয়ার কথা বললেন।

ভুলে যাওয়া স্মৃতিটা এত কাল পরে ফিরে এল কেন?

মনটা বেশ খুশি খুশি লাগছে। রিপোর্টে ঠিক ফাঁসির হুকুম আসেনি, আবার পুরোপুরি ছাড়া পাওয়া যায়নি। দণ্ডাজ্ঞা কিছু দিনের জন্য স্থগিত রইল। বায়োপসিতে ক্যানসার ধরা পড়েছে ঠিকই, কিন্তু ডাক্তার দৃঢ়ভাবে বলেছেন, অপারেশনে তিনি যতখানি বাদ

দিয়েছেন, তারপর আর ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে ছমাস অন্তর অন্তর চেকআপ করাতে হবে।

নার্সিংহোম থেকে এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পাওয়া যাবে, তা-ও আশা করা যায়নি। তিনি কানাঘুষো শুনেছিলেন, কলকাতার ডাক্তাররা বাংলাদেশিদের কাছ থেকে বেশি টাকা রোজগার করার জন্য ইচ্ছে করে বেশি দিন নার্সিংহোমে আটকে রাখে। কিন্তু মিন্টুর সঙ্গে আগে থেকে পরিচয় থাকার জন্যই হোক বা যে-কারণেই হোক, এ ডাক্তারটি সেরকম চশমধোর নয় দেখা যাচ্ছে। সিরাজুল চৌধুরীকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে তিনি বললেন, শুধু শুধু নার্সিংহোমে শুয়ে থেকে কী করবেন? বাড়ি চলে যান। হাঁটুন। সিগারেট ছাড়া আর যা ইচ্ছে করে খাবেন। স্বাভাবিক জীবন যাপন করুন।

ইচ্ছে করলেই তো ফিরে যাওয়া যায় না। টিকিট কাটা আছে সাত তারিখের। সে-টিকিট বদলানো যাচ্ছে না। ঢাকায় ক্রিকেট খেলা হচ্ছে বলে বিমানের টিকিটের খুব ডিমান্ড, বড়জোর একটা পাওয়া যেতে পারে, একই ফ্লাইটে তিনখানা অসম্ভব।

অগত্যা আরও দু'দিন থেকে যেতে হবে।

রেহানা এই প্রথম বার ইন্ডিয়ায় এসেছে। তার খুব আগ্রা-দিল্লি দেখার শখ। এবারে তা সম্ভব নয়। তবে, এক দিনের জন্য শান্তিনিকেতন ঘুরে আসা যেতে পারে।

সিরাজুল চৌধুরীও কখনও শান্তিনিকেতন যাননি। মিন্টু অবশ্য দু'বার গেছে, সে কবি, নানা কবি সম্মেলনে আমন্ত্রণ পায়।

সিরাজুল চৌধুরীর দুই ছেলেই জার্মানিতে থাকে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে রাজশাহি আর সিলেটে। স্ত্রী গত হয়েছেন দু'বছর আগে। শ্যালক মিন্টুই এখন তার প্রধান ভরসা। শান্তিনিকেতনে বেড়াবার প্রস্তাবে রেহানাও খুব খুশি।

শান্তিনিকেতনের ট্রেন সকাল দশটায়। সিরাজুল চৌধুরী নিজেই দিব্যি প্ল্যাটফর্মে হেঁটে গিয়ে ট্রেনে উঠলেন। এ ট্রেনে তেমন ভিড় হয় না, লোকজনের ঠেলাঠেলি নেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন যাওয়া হল না।

ট্রেনটা বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছতেই সিরাজুল চৌধুরীর বুকের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করে উঠল। চোখে আবার ভেসে উঠল সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়া বালকের দৃশ্যটা। তিনি উতলা ভাবে বললেন, মিন্টু, এখানে একবার নামবে?

মিন্টু বলল, বর্ধমানে? এখানে কী দেখার আছে?

সিরাজুল চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো চলো নামি, কথা আছে, নেমে বলব। তাড়াহুড়ো করে ওঁরা নামতেই ট্রেনটা ছেড়ে গেল।

রেহানা বলল, মুসাফির, তুমি তোমার নামটা সব সময় সার্থক করতে চাও? কখন কোথায় যাবে, ঠিক নেই! বর্ধমানে নামার কথা আগে বলোনি!

সিরাজুল চৌধুরী একটু অপরাধী, একটু লাজুক মুখ করে বললেন, আমি আগে ভাবিনি। স্টেশনের নামটা দেখে মনে পড়ল। এইখানে আমাদের বাড়ি ছিল, আমি এখানে জন্মেছি। সেই জন্মস্থানটা দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল। একবার শুধু দেখে আসি, পরের ট্রেনে না হয় শান্তিনিকেতন যাব।

সে-বাড়ি বর্ধমানে শহরে নয়, খানিকটা দূরে, জায়গাটার নাম তালিত। সিরাজুল চৌধুরীর মনে আছে। বাস যায়, কিন্তু তিনি ভিড়ের বাসে উঠতে পারবেন না। মিন্টু একটা গাড়ি ভাড়া করে ফেলল।

গাড়িতে ওঠার পর মিন্টু বলল, সে-বাড়ি কি এখন আছে? আপনারা অ্যাবানডান করে চলে গিয়েছিলেন, এখানকার লোকেরা জবরদখল করে ভেঙেচুরে ফেলেছে। কত কাল আগের ব্যাপার!

সিরাজুল চৌধুরী বললেন, আমরা বাড়ি অ্যাবানডান করিনি। রিফিউজি হয়ে ঢাকায় যাইনি। ভাগ্য ভাল ছিল, আমরা বাড়ি এক্সচেঞ্জ করেছিলাম। নারায়ণগঞ্জে আমাদের বাড়িটা ছিল আগে এক হিন্দু ভদ্রলোকের। তার সঙ্গে আমরা এই বাড়িটা বদল করতে পেরেছিলাম ঠিক সময়ে। ফার্নিচার সমেত। পার্টিশনের সময় আমরা মনে করেছিলাম, ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের মধ্যে যাতায়াতের জন্য ভিসা-পাসপোর্ট লাগবেনা। আবার এ বাড়িটা দেখতে আসব। তা আর হল কই? পাকিস্তানি আমলে তো আসাই যেত না।

রেহানা বলল, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তো তুমি কয়েক বার কলকাতা এসেছ। তখন যাওনি?

সিরাজুল চৌধুরী বললেন, না রে। প্রত্যেক বার কাজেই এসেছি। একবার সোজা গেলাম আজমিড় শরিফ, এই বর্ধমানের ওপর দিয়েই তো সে-ট্রেন গেল, তখন ইচ্ছে হয়নি। ঠিক মনেও পড়েনি।

এতগুলি বছর, কত বছর হয়ে গেল?

তোর বয়সের থেকে দ্বিগুণ তো হবেই।

এখন গেলে চিনতে পারবে?

একটা আশ্চর্য ব্যাপার কি জানিস? ভুলেই গেছিলাম। কিন্তু নার্সিংহোমের বিছানায় শুয়ে শুয়ে কী করে যেন আবার সব মনে পড়ে যেতে লাগল। স্পষ্ট দেখলাম বাড়িটাকে। পিছনে একটা মস্ত বড় দিঘি। কাকচক্ষুর মতো পরিষ্কার, টলটলে পানি, মাঝখানে পদ্মফুল। লাল রঙের বাঁধানো ঘাটলা। বাগানও ছিল। অনেক গাছ, কিন্তু বেশি করে মনে পড়ল পাশাপাশি দুটো জম্ভুরা গাছের কথা। এ-দেশে বলে বাতাবি লেবু। এত বেশি জম্বুরা হত, খাওয়ার লোক নাই, বড় বড় জম্বুরা, আমরা ছোটরা সেইগুলি দিয়ে ফুটবল খেলতাম।

সে-বাড়ি কি আর আছে? পঞ্চাশ বছরেকত কিছুই বদল হয়ে যায়।

গিয়ে দেখাই যাক না। বেশিক্ষণ লাগবেনা।

ঠিকানা মনে আছে?

ঠিকানা? তখন তো ঠিকানা ছিল না। বাড়ির কর্তার নাম শুনলে লোকে বলে দিত। নারায়ণগঞ্জের যে-হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে বাড়িটা এক্সচেঞ্জ করেছিলাম, তার নামটাও মনে পড়ে গেছে। বলরাম চৌধুরী। তার ছোট ভাইয়ের নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী। হিন্দুদের মধ্যেও চৌধুরী হয়, জানিস তো?

মিন্টু বলল, এটা সবাই জানে। প্রমথ চৌধুরী নামে একজন বড় রাইটার ছিলেন না? রবীন্দ্রনাথের ভাইয়ের মেয়ে ইন্দিরাকে যিনি বিয়ে করেছিলেন, সবুজ পত্র পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

সিরাজুল বললেন, তোরা যে কতখানি জানিস, আর কতখানি জানিসনা, তা আমি ঠিক বুঝি না।

রেহানা বলল, আমাদের মধ্যেও ঠাকুর পদবি হয়। আমি কাগজে দেখি নাম মাঝে মাঝে। তাহের ঠাকুর আছে না এক জন?

সিরাজুল বললেন, ঠিক বলেছিস। ঠাকুররা পিরিলিব বামুন। ওদের ফ্যামিলির একটা ব্রাঞ্চ মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তারাই বোধহয় এখনও নামের সঙ্গে ঠাকুর জুড়ে রেখেছে।

রেহানা জিজ্ঞেস করল, বাড়িটা কি শহরে মধ্যেই ছিল?

সিরাজুল বললেন, না, বেশ ফাঁকা ফাঁকা জায়গা। তালিত-এর বাজারে গেলেই আমার চিনতে অসুবিধে হবে না। বাজারের পুব দিকে একটা সোজা রাস্তা গেছে। প্রায় আধ মাইল পর আর বাড়িঘর বিশেষ নাই, ফাঁকা ফাঁকা, ধানখেত, একটা বড় বটগাছের কাছে রাস্তাটা

দুই ভাগ হয়ে গেছে, তার নিকটেই আমাদের বাড়ি। একেবারে ছবির মতো স্পষ্ট দেখতে পাই।

তালিত বাজারের কাছে পৌঁছে কিন্তু দিশা পাওয়া গেল না। সাইকেল রিকশা, ঠেলা গাড়ি, ট্রাকের গ্যাঞ্জাম। তিন দিকের তিনটে রাস্তা, তার মধ্যে কোনটা পুব দিকে তা বোঝাই শক্ত। কয়েক জনকে জিজ্ঞেস করা হল, বলরাম চৌধুরীর বাড়িটা কোথায়? কেউ কিছু বলতে পারে না।

তারপর জানা গেল, ওরা গাড়িতে যে-পথে এসেছে, সেটাই পুব দিকের রাস্তা। অর্থাৎ সিরাজুল চৌধুরী তার জন্মস্থানের পাশ দিয়েই এসেছেন। তিনি চিনতে পারেননি।

রেহানা ফিক ফিক করে হাসতে লাগল।

খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে সিরাজুল বললেন, ধানখেত তো দেখলাম না। আর সেই বটগাছটাও।

গাড়ি ঘুরিয়ে নেওয়া হল।

রাস্তার দু'ধারে একটুও ফাঁকা নেই, পর পর বাড়ি। আধ মাইল কেন, এক মাইলের মধ্যেও কোনও বড় বটগাছ নেই।

রেহানা বলল, মুসাফির, তোমার সেই বটগাছ কবে ঝড়ে পড়ে গেছে।

মিন্টু বলল, তাহলে বর্ধমানেই ফিরে যাওয়া যাক?

সিরাজুল আফশোসের সুরে বললেন, শুধু শুধু ট্রেন থেকে নামলাম! গেল কোথায় বাড়িটা? অদৃশ্য হয়ে যেতে তো পারে না? বাগান, দিঘিটা তো থাকবে?

আবার লোকজনদের জিজ্ঞেস করায় কয়েক জন একটা চৌধুরীবাড়ি দেখিয়ে দিল। সেটা এক তলা বাড়ি, সঙ্গে চুন-সুরকির দোকান। তারা চৌধুরী বটে, কিন্তু বলরাম-শ্রীকৃষ্ণের নাম শোনেনি।

তারা আর একটা চৌধুরী বাড়িতে পাঠিয়ে দিল।

স্মৃতি খানিকটা প্রতারণা করেছে সিরাজুল চৌধুরীর সঙ্গে।

বড় রাস্তায় কোনও বটগাছ নেই। একটা সরু রাস্তা দিয়ে এঁকেবেঁকে খানিকটা যাবার পর দেখা গেল ধানের খেত, দূরে মাঠের মধ্যে একটা বটগাছ। এই সরু রাস্তার শেষ বাড়িটা দেখে সিরাজুল প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, এই তো এটাই সেই বাড়ি! পেয়েছি!

সিরাজুল চৌধুরীর মনের ছবিতে তাদের বসতবাড়িটা ছিল তিন তলা, কিন্তু এ বাড়িটা দো-তলা। বড় দিঘি নেই, একটা মাঝারি আকারের পুকুর আছে বটে, তার অর্ধেকটা পানায় ভর্তি। বাগান কোথায়? কোথায় জাম্বুরা গাছ?

কিন্তু দো-তলার একটা বারান্দা আর সদর দরজাটা দেখে সিরাজুল চৌধুরী দৃঢ়ভাবে বললেন, এইটাই সেই বাড়ি। আই অ্যাম ডেফিনিট।

বাড়িটার অবস্থা প্রায় জরাজীর্ণ। এক দিকের দেয়ালের গা দিয়ে অশত্থ গাছের চারা উঠেছে। রঙ করা হয়নি অনেক দিন।

সদর দরজা বন্ধ।

সবাই নামল গাড়ি থেকে। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা, সূর্য মধ্যগগনে, এর মধ্যেই গরম পড়েছে খুব।

দরজার পাশের দেয়ালে একটা শ্বেত পাথরের ট্যাবলেটে লেখা ‘চৌধুরী ধাম’। তা দেখে শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে সিরাজুল বললেন, দেখেছিস, নামটা প্রায় একই আছে। আমাদের সময় লেখা ছিল ‘চৌধুরী লজ’ ।

রেহানা বলল, যাক, পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত! দেখাও হল। এখন অন্যের বাড়ি, ভিতরে কি আর যেতে দেবে?

সিরাজুল বললেন, একবার শুধু ভিতরের সিঁড়িটা দেখব।

কলিং বেল নেই, কড়া নাড়তে হল।

একটু পরে দরজা খুলে দিল এক জন মাঝবয়সী স্ত্রীলোক। ছিরিছাঁদহীন ঢ্যাঙা চেহারা, চুলের খোঁপাটা মাথার মাঝখানে, শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে বাঁধা।

তিন জন আগন্তুককে চোখ বুলিয়ে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বেশ খ্যারখেরে গলায় সে জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই?

যা বলার তা সিরাজুল চৌধুরীকেই বলতে হবে, মিন্টু আর রেহানা তার পেছনে।

সিরাজুল বললেন, এটা কি বলরাম চৌধুরীর বাড়ি?

স্ত্রীলোকটি বলল, না। এটা অবনী চৌধুরীর বাড়ি।

সিরাজুল বুঝলেন, বলরাম চৌধুরী ছিলেন তার বাবার বয়সী। এত দিন তার বেঁচে থাকার কথা নয়। কিন্তু এরপর কী বলা উচিত, তা তিনি আগে ভাবেননি।

একটু আমতা আমতা করে বললেন, আমরা এই বাড়ির ভেতরটা একবার দেখতে পারি?

স্ত্রীলোকটি মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, কেন? এ বাড়ি বিক্রি আছে, তা আপনাদের কে বলেছে? মোটেই বিক্রি নেই।

সিরাজুল বললেন, না না, আমরা বাড়ি কিনতে আসিনি। শুধু ভেতরটা একবার দেখেই চলে যাব।

স্ত্রীলোকটি বলল, যে-সে উটকো লোক এসে ভেতরে ঢুকতে চাইলেই দেব? মামাবাড়ির আবদার।

তারপর সে মুখ ফিরিয়ে বাড়ির ভেতরের কারুকে উদ্দেশ করে বলল, অ বউদি। কারা সব এসেছে, ভেতরে ঢুকতে চাইছে। সঙ্গে আবার এক জন পুলিশ এনেছে!

সিরাজুল বিস্মিত ভাবে বললেন, কই, আমরা তো পুলিশ আনিনি!

স্ত্রীলোকটি মিন্টুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই লোকটাই তো পুলিশ। আর একদিন এসেছিল।

মিন্টু যেন আকাশ থেকে পড়ে বলল, আমি পুলিশ? আমাদের সাত জন্মে কেউ পুলিশে কাজ করেনি। আমি জীবনেও এখানে আগে আসিনি।

ভেতর থেকে একটা নারীকণ্ঠ শোনা গেল, এই নারানী, অত কথা বলার দরকার কী? দরজা বন্ধ করে দে।

স্ত্রীলোকটি ঝপাস করে দরজা বন্ধ করে দিল ওদের মুখের ওপর।

অপমানে মুখখানা কালো হয়ে গেল রেহানার।

সে ফিরে যেতে লাগল গাড়ির দিকে।

সিরাজুল অতটা অপমান গায়ে মাখলেন না। তিনি বললেন, তাহলে বাইরে থেকেই একটু দেখে যাই। ছোটবেলায় এই পুকুরটাকেই মনে হত কত বড়। অনেক মাছ ছিল! অ্যাত্ত বড় বড় কাতল মাছ।

রেহানা ঝাঁঝালো গলায় বলল, আর দেখতে হবে না। এবার চলো ফিরে যাই। এরা অতি অভদ্র।

এইসময় সাইকেলে চেপে এক জন লোক এল সেখানে। বছর তিরিশেকের এক যুবক। খানিকটা কৌতূহল, খানিকটা সন্দেহমাখা চোখে সে দেখল এঁদের। তারপর জিজ্ঞেস করল, আপনারা কোথা থেকে আসছেন? কাকে চাইছেন?

মিন্টু গম্ভীর ভাবে বলল, আমরা কারুকে চাই না। দুলাভাই, চলেন, চলেন।

ওরা দুজনে এগোল গাড়ির দিকে।

যুবকটির ভুরু কুঁচকে গেল। সে সাইকেল থেকে নেমে কাছে এসে বলল, কী ব্যাপার? আপনারা আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছিলেন। এখন কিছু না বলে চলে যাচ্ছেন? আপনাদের কে পাঠিয়েছে?

মিন্টু কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে সিরাজুল বললেন, ব্যাপার কিছু নয়। কেউ আমাদের পাঠায়নি। ইট সো হ্যাপেন্ড, আমি এই বাড়িতে জন্মেছিলাম। তাই শুধু একবার দেখতে এসেছি। আপনাদের আপত্তি থাকলে ভিতরেও যেতে চাই না। বাইরে থেকে দেখায় কি দোষ আছে?

আপনি এখানে জন্মেছিলেন মানে?

আপনার বয়স কম, আপনার জানবার কথা নয়। পার্টিশনের আগে, এ জায়গাটা ছিল আমার বাবা-দাদাদের প্রপার্টি। নারায়ণগঞ্জের বলরাম চৌধুরীর বাড়ির সঙ্গে এটা এক্সচেঞ্জ করা হয়েছিল। এর ওপর আমাদের কোনও দাবি নেই। শুধু একটু চোখের দেখা। নস্টালজিয়া বলতে পারেন।

আপনারা বাংলাদেশ থেকে আসছেন?

জি। আমার নাম সিরাজুল চৌধুরী। এ আমার শ্যালক, আরদুল কাদের, এক জন নামকরা কবি, আপনি হয়তো নাম শুনে থাকতে পারেন। আর ওই যে রেহানা, আমার শ্যালকের কন্যা।

যুবকটির ভুরুও কপালের ভাঁজ মিলিয়ে গেল। হাসিমুখে বলল, ও এই ব্যাপার? আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।

মিন্টু বলল, না, আর ভেতরে যাবার দরকার নেই। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

যুবকটি বলল, একটু বসবেন চলুন। আসন্ত্র ব্যাপার কি হয়েছে জানেন, আমার খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে এই বাড়িটা নিয়ে মামলা চলছে। মামলা এখনও শো হয়নি, ওরা জোর করে বাড়িতে ঢুকে পজেশান নিতে চাইছে। একবার ঢুকে পড়লে তাড়ানো মুশকিল। তাই সাবধানে থাকতে হয়। আসুন।

রেহানা বলল, আমি গাড়িতে বসে থাকছি। তোমরা দেখে এসো।

যুবকটি হেসে বলল, তা বললে কি হয়? এই গরমে গাড়িতে বসে থাকবেন? এক গেলাস জল খেয়ে যান অন্তত।

.

০৩.

পৌরাণিক কাহিনিতে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই ভাইয়ের খুব গলাগলি ভাবছিল। কৃষ্ণ মহাশক্তিমান হলেও মান্যগণ্য করতেন তার বড় ভাই বলরামকে। বলরাম বেশ মাতাল ছিলেন, কৃষ্ণও অর্জুনের সঙ্গে বসে মদ্যপান করতেন বটে, তবে কখনও বেচাল হতেন না, বলরাম কখনও বাড়াবাড়ি করে ফেললে কৃষ্ণই সামলাতেন।

নারায়ণগঞ্জের কাঠের ব্যবসায়ী বলরাম চৌধুরীর সঙ্গে তার ছোট ভাই কৃষ্ণ চৌধুরীর কিন্তু তেমন সদভাব ছিল না। বলরাম ছিলেন উদ্যমী, কর্মী পুরুষ, কৃষ্ণ সেই তুলনায় কোনও কম্মের নয়। বলরাম নিজের চেষ্টায় কাঠের ব্যবসা দাঁড় করিয়েছিলেন, আর কৃষ্ণ-পাশা খেলে সময় কাটাত, গাঁজার নেশাও করত। টাকার চিন্তা ছিল না, সে জানত, দাদাই তাকে সারা জীবন খাওয়াবে।

বলরাম চৌধুরী ছিলেন নিঃসন্তান, কৃষ্ণর চার ছেলে মেয়ে। কৃষ্ণ ধরেই রেখেছিল, দাদার বিষয় সম্পত্তি তার ছেলে মেয়েরাই পাবে। সেটাই স্বাভাবিক ছিল।

হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল। প্রৌঢ় বয়সে বলরাম চৌধুরীর স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান জন্ম দিলেন। জন্মের পর সেই সন্তানের জীবন-সংকট দেখা গিয়েছিল। বেঁচে গেল কোনও ক্রমে। তাতেই বদলে গেল সব কিছু।

বেশি বয়সের ছেলে অতি আদরের হয়। বাবা-মায়ের সে একেবারে নয়নের মণি। যথারীতি বলরাম চৌধুরী নিজের সন্তানকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন। সেই সন্তানের নাম অবনী।

বলরাম চৌধুরী তার ছোট ভাই কৃষ্ণ এবং তার ছেলে-মেয়েদেরও একেবারে বঞ্চিত করেননি। দেশবিভাগের পর এক মুসলমান পরিবারের সঙ্গে বাড়ি বদল করে বর্ধমানে চলে আসেন। সঙ্গে যথেষ্ট টাকাকড়িও নিয়ে আসতে পেরেছিলেন, নৈহাটিতে কৃষ্ণর জন্য একটি ছোট বাড়ি কিনে দিলেন, স্টেশনের কাছে একটা জামাকাপড়ের দোকানও সাজিয়ে দিলেন, তার আয়ে কৃষ্ণর সংসার বেশ ভালভাবেই চলে যাবার কথা।

বলরাম এবং কৃষ্ণ দু'জনেই মারা গেছেন বছর পনেরো আগে।

বলরামের ছেলের অবনী লেখাপড়ায় বেশ ভাল হয়েছে। এখন সে সায়েন্স কলেজে ফিজিক্স পড়ায়, তাছাড়া তার ইলেকট্রনিক্সের ব্যবসা আছে। কলকাতাতেও ফ্ল্যাট কিনেছে, সেখানেই বেশির ভাগ সময় থাকে।

সেই তুলনায় কৃষ্ণর ছেলেরা অপদার্থ। ছোট ছেলেটি তো হিংস্র প্রকৃতির, জুট মিল এলাকায় গুণ্ডামি করে বেড়ায়, আপাতত সে জেলে। বড় ছেলেটি অসুস্থ। মেজোটিই ধুরন্ধর। কাপড়ের দোকানটা ঠিক মতো চালাতে পারে না, সে-ই মামলা করেছে অবনীর বিরুদ্ধে। তার দাবি, বর্ধমানের এত বড় বাড়িটা, পুকুর ও অনেকখানি জমি, এটা তাদের পারিবারিক যৌথ সম্পত্তি, সুতরাং এই সব কিছুতে তাদেরও ভাগ আছে। এ মামলায় তাদের জয়ের সম্ভাবনা কম, কারণ বলরাম চৌধুরীর উইলে সব কিছু তার ছেলের নামে স্পষ্ট লেখা আছে। মামলা নিষ্পত্তির আগেই কৃষ্ণর ছেলেরা জোর করে এ বাড়িতে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেছে দু'বার।

অবনীর বৃদ্ধা মা কলকাতায় যাননি, তিনি এ বাড়িতেই থাকেন। আর থাকে এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়া, তার যেমন উগ্র মেজাজ, সেই রকম চোপা। সেই নারায়ণীই সিরাজুল চৌধুরীর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

অবনীর সঙ্গে সেই দলটিকে ফিরে আসতে দেখে নারায়ণী তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। বিশেষ করে মিন্টুর দিকে। তার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে, এই লোকটি ছদ্মবেশী পুলিশ।

ভেতরের উঠোনে এসে অবনী বলল, সিরাজ সাহেব, চিনতে পারছেন? ভেতরটা বিশেষ বদলায়নি।

সিরাজুল তাকালেন সিঁড়িটার দিকে।

নার্সিংহোমে শুয়ে চোখ বুজে তিনি এই সিঁড়িটাই দেখছিলেন বার বার।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো তিনি সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন খানিকটা। আবার নেমে এলেন।

মিন্টু আর রেহানা খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের তো এই বাড়ি নিয়ে কোনও স্মৃতি নেই। তারা উদ্বেল হবে কেন? সিরাজুল সাহেবের ব্যবহার তাদের কাছে খানিকটা বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে।

সিরাজুল নেমে এসে, মুখ ফাঁক করে সোনার দাঁতটা দেখিয়ে বললেন, এই যে দেখছ আমার একটা দাঁত ভাঙা? এই সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গিয়ে ভেঙেছিল।

রেহানা এবার হেসে ফেলে বলল, শুধু দাঁত ভাঙার কথাটাই তোমার আগে মনে পড়ল?

সিরাজুল বললেন, সত্যি রে, কেন জানি, এটাই বার বার মনে আসছিল। পুকুর থেকে একটা বড় কাতলা মাছ ধরে এনে এই উঠোনে রেখেছিল, মাছটা লাফাচ্ছিল। সেটা দেখার জন্যই তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে-।

অবনী বলল, চলুন, ওপরে চলুন!

সিরাজুল বললেন, না না। আর উপরে যাবার দরকার নেই।

অবনী বলল, কেন, ওপরটা ঘুরে দেখলে আপনার হয়তো আরও অনেক কিছু মনে পড়ে যেতে পারে।

রেহানা বলল, আমাদের এবার যেতে হবে।

অবনী বলল, এত তাড়া কীসের?

রেহানা বলল, আমরা শান্তিনিকেতনে যাব।

সিরাজুলের দিকে ফিরে বলল, তোমার জন্মস্থানের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান আমি ভাল করে দেখতে চাই। এবার চলো!

সিরাজুল কিছু বলার আগেই অবনী বলল, শান্তিনিকেতন তো রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান নয়। সে যাই হোক, শান্তিনিকেতনও দেখবার মতো। দেখবেন, দেখবেন। শান্তিনিকেতনের ট্রেন তো সেই বিকেলে।

সিরাজুল বললেন, রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। সেটাও দেখাব।

অবনী বলল, ওঃ আপনাদের জল দেওয়া হয়নি। ও পিসি, বাড়িতে মিষ্টি-টিষ্টি কিছু আছে? নেই বোধহয়। আমি তো কালই এসেছি। একটু বসবেন চলুন।

সিরাজুল হাত তুলে বললেন, না না, মিষ্টির দরকার নেই। আমার ডায়াবেটিস আছে, তাছাড়া রিসেন্টলি অপারেশন হয়েছে। মিষ্টি খাওয়া একেবারে নিষেধ। আগে কলকাতার মিষ্টি ভালবাসতাম। আর ওই যে আমার শালার মেয়েকে দেখছেন, আজকালকার মেয়ে, মিষ্টি ছোঁয় না। ফিগার ঠিক রাখতে হবে তো, ডায়েটিং করে।

অবনী এক পলক রেহানার দিকে তাকিয়ে তার তনুশ্রীর তারিফ করল।

মিন্টু বলল, আমার এক গেলাস পানি, ইয়ে, জল পেলেই চলবে।

অবনী ওদের প্রায় জোর করেই নিয়ে এল বসবার ঘরে।

পুরনো আমলের সোফা ও চেয়ার-টেবিল দিয়ে সাজানো, কিন্তু ধূলিমলিন। অনেক দিন ব্যবহার করা হয় না, বোঝাই যায়।

অবনী জিজ্ঞেস করল, এই ঘরটা চিনতে পারেন?

সিরাজুল দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, না।

অবনী বলল, ঘরটা আগে ছোট ছিল। বাবা মাঝখানের দেয়ালটা ভেঙে দুটো ঘর মিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বোধহয় ভেবেছিলেন, বাড়িতে অনেক লোকজন আসবে, বড় বৈঠকখানা দরকার। কোথায় লোকজন? আমাদের তো এখন এখানে থাকাই হয় না। কলকাতায় আমার অনেক কাজ।

একটা ঝাড়ন দিয়ে সে ধুলো সাফ করতে লাগল।

একটি বাচ্চা ছেলে কাচের জাগে জল আর কয়েকটা গেলাস নিয়ে এল একটু পরে।

অবনী বলল, ইস, শুধু জল, এমন লজ্জার ব্যাপার!

সিরাজুল বললেন, আগেকার দিনে দেখেছি, হিন্দুবাড়িতে কারুকে জল দেবার সময়, অন্য মিষ্টি না থাকলে কয়েকখানা বাতাসা দিত। এখন বোধকরি বাড়িতে বাতাসা রাখা হয় না।

অবনী বলল, বাতাসা? প্রায় উঠেই গেছে। অনেক দিন দেখি না।

রেহানার মুখে-চোখে অধৈর্য ফুটে উঠেছে। গেলাস নামিয়ে রেখে সে বলল, আমরা এখন যাব না?

সিরাজুল বললেন, হ্যাঁ যাব। চলো। ধন্যবাদ অবনীবাবু। আপনিও একবার বাংলাদেশ আসুন। নারায়ণগঞ্জে আপনাদের বাড়িটা প্রায় একই রকম আছে। দেখে আসবেন।

অবনী হেসে বলল, সে-বাড়ি তো আমি জীবনে দেখিইনি। আমার জন্ম দেশভাগের অনেক পরে। আমার তো কোনও নস্টালজিয়া নেই!

সিরাজুল বললেন, তবু বাপ-দাদার ভিটে তো। উঠানে একটা তুলসি মঞ্চ ছিল, সেটাও ভাঙা হয় নাই। তুলসিগাছ আর নাই অবশ্য।

অবনী জিজ্ঞেস করল, একটা ব্যাপারে আমার কৌতূহল হচ্ছে। আপনারা এই বাড়ি ছেড়ে ইস্ট পাকিস্তানে চলে গেলেন কেন? এখানে কি দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছিল?

সিরাজুল বললেন, আমি তো তখন বালক ছিলাম, সব মনে নাই। আমার বাবার কাছে অনেক গল্প শুনেছি। না, দাঙ্গা বোধহয় এ-দিকে হয়নি তেমন। কারণটা ছিল অন্য। আমার বাবা ছিলেন সরকারি উকিল। সে-সময়, ইন্ডিয়া-পাকিস্তান ভাগ হবার পর, সরকারি কর্মচারীদের অপশান দেওয়া হয়, যার ইচ্ছা ইন্ডিয়ায় থাকবে, যার ইচ্ছা পাকিস্তানে চলে যাবে। বাবা তবু দোনামোনা করছিলেন। সাধারণ অবস্থা থেকে উঁচুতে উঠেছিলেন, এ বাড়িটা অনেক শখ করে বানিয়েছিলেন। ছেড়ে যাবার ইচ্ছা ছিল না।

এই অঞ্চলে তো অনেক মুসলমান রয়ে গেছে। দু'জন মুসলমান উকিলও আছেন। আমাদের মামলা দেখছেন মিস্টার আমিনুল হক।

আমাদের যাবার কারণ অন্য। বর্ধমানে তখন খুব বড় নেতা ছিলেন আবুল হাসেম। একালের ছেলে মেয়েরা বোধহয় তার নাম জানে না, তবে সেকালে তার খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। এখনকার নামজাদা লেখক বদরুদ্দীন ওমনর ওনারই ছেলে। আবুল হাসেম শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যান। ওই হাসেম সাহেব ছিলেন আমার বাবার মুরুব্বি। বাবা তার পরামর্শ নিতে গেলেন। হাসেম সাহেব বললেন, আমিও যাচ্ছি, তুমিও চলো ও-পারে। নতুন দেশ গড়া হচ্ছে, তোমাদের মতো শিক্ষিত লোকদের খুব দরকার হবে। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জের বাড়িটা সুবিধামতো পাওয়া গেল। বাবা ওখানে গিয়ে বাড়ির পাশে পুকুর কাটালেন।

আমার বাবাকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনিও দাঙ্গার ভয়ে পালিয়ে আসেননি। নারায়ণগঞ্জে ওঁর কাঠের ব্যবসায়ে নাকি এক জন রাইভাল ছিল। সে খুব শত্রুতা করত। দেশভাগের ডামাডোলে সে যদি কোনও ক্ষতি করে, এই আশঙ্কা ছিল বাবার। তারও ইচ্ছে ছিল না আসার। তবু তো আমরা লাকি, সম্পত্তি এক্সচেঞ্জ করতে পেরেছি। কত লোক তা-ও পারেনি।

ও-দিকে আপনাদের আর কেউ নাই?

টাঙ্গাইলে আমার পিসেমশাইরা রয়ে গেছেন শুনেছি। অনেক দিন কোনও যোগাযোগ নেই। আমার মায়ের অনেক বয়স হয়েছে, সব কথা মনে রাখতে পারেন না।

আমাদেরও কিছু কিছু আত্মীয় আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে। বারাসাতে থাকেন আমার মামাতো ভাইরা। এই সময় নারায়ণী দরজার আড়াল থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকল অবনীকে।

অবনী উঠে গিয়ে ফিসফিস করে কথা বলে ফিরে এল। তারপর হাত জোড় করে বলল, মা বলে পাঠিয়েছেন, অনেক বেলা হয়ে গেছে, আপনাদের দুটি ডালভাত খেয়ে যেতে হবে।

রেহানা আর মিন্টু একসঙ্গে বলে উঠলো, না না, আমরা এখন খাব না।

অবনী বলল, গৃহস্থবাড়ি থেকে কিছু না খেয়ে গেলে অকল্যাণ হয়। এই ভরদুপুরে... অবশ্য ভাতের বদলে লুচিও খেতে পারেন।

মিন্টু এবার মিথ্যে করে বলল, আমাদের তাড়াতাড়ি বর্ধমান ফিরতে হবে, ওখানকার একটা হোটেলে খাওয়ার কথা বলে এসেছি।

হাত নেড়ে হোটেলের কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিয়ে অবনী বলল, হোটেলে তো জীবনে আরও কতবারই খাবেন, আমাদের বাড়ি থেকে কিছু অন্তত...সত্যি কথা বলছি, আপনাদের আপ্যায়ন করার মতো তেমন কিছুই নেই, আমার লজ্জাই করছে, তবু যদি দয়া করে... দেখুন খুব মেঘ করেছে হঠাৎ, বৃষ্টি নামবে, খিচুড়ি করে দেওয়া যেতে পারে, তাড়াতাড়ি হবে।

রেহানা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ধন্যবাদ। শুধু খাওয়ার জন্য আর দেরি করার কোনও মানে হয় না। এবার আমাদের যেতেই হবে।

অবনী সিরাজুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, থাকবেন না?

সিরাজুল এতক্ষণ কিছু বলেননি। এবার তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী রে, কী করবি?

রেহানা অস্থির ভাবে বলল, মুসাফির, ওঠো।

সিরাজুল গা মুচড়ে বললেন, এঁরা এত করে বলছেন। আমার লুচি খাওয়ার নিষেধ আছে, তবে খিচুড়ি আমি ভালবাসি!

এরপর আর অন্য দু'জনের আপত্তি টেকে না।

সোফায় হেলান দিয়ে বসে সিরাজুল বললেন, একটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, এত দিন আমার ধারণা ছিল, এই বাড়ি সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছুই মনে নাই। এখানে এলে টুকরো টুকরো অনেক কিছুই মনে পড়ে যাচ্ছে। সাবকনশাস মাইন্ডে এ-সব লুকিয়ে ছিল। আতাউর নামে আমার এক খেলার সাথি ছিল এখানে, ডাক নাম ছিল আতা। আমাদের চলে যাওয়ার দিনে সে খুব কেঁদেছিল। স্পষ্ট মনে পড়ে তার মুখখানা। তাদের পরিবারের কেউ পাকিস্তানে যায় নাই, কী জানি সেই আতাউর এখন এখানে থাকে কি না!

অবনী বলল, এখানে বেশ কিছু খানদানি মুসলমানের বাড়ি আছে, সেখানে গিয়ে খোঁজ করা যেতে পারে।

সিরাজুল বললেন, আতাউররা খানদানি ছিল না, ওর বাবা ছিল আমাদেরই কর্মচারী, ওর একটা ছোট বোন ছিল, তার নাম পারভিন, তার মুখের হাসিটা এত মিষ্টি, ওই যে বলে না, কথা বললে মুক্তা ঝরে পড়ে।

মিন্টু বলল, তার সাথে আপনার রোমান্স ছিল নাকি?

সিরাজুল বললেন, ছিল তো বটেই। নয় বছরের ছেলের সাথে সাত বছরের মেয়ের যতখানি রোমান্স হতে পারে। আর একটা কথাও মনে পড়ছে। আমাদের এ বাড়ির ছাদ থেকে ট্রেনলাইন দেখা যায়, তার পাশে পাশে কাশফুল ফুটে থাকত। ট্রেন আসার শব্দ শুনলেই আমি ছাদে উঠে ট্রেন দেখতাম। তখন অবশ্য আমরা বলতাম রেলগাড়ি। পরে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালি ফিল্মটা যখন দেখলাম, অপু আর দুর্গা ছুটতে ছুটতে কাশফুলের মধ্য দিয়ে ট্রেন দেখতে যাচ্ছে, তখন নিজের সঙ্গে খুব মিল খুঁজে পেয়েছিলাম।

রেহানা বলল, তুমি বললে, আমাদের বাড়ি! পঞ্চাশ বছর আগে ছেড়ে চলে গেছ!

সিরাজুল বললেন, সেটাও পিকিউলিয়ার ফিলিং হচ্ছে। এত বছর নারায়ণগঞ্জের ওই বাড়িতে আছি, কিন্তু যেহেতু বাপ-দাদারা ওই বাড়ি তৈরি করেননি, তাই ওটা ঠিক যেন নিজের বাড়ি মনে হয় না। এটাই যেন আসল নিজের বাড়ি। বার বার ফিরে যাচ্ছি শৈশবে। বৃদ্ধ বয়সে বোধকরি এ-রকমই হয়।

অবনী বলল, আপনি এ বাড়িটা কিনে নিন না। আবার আপনার নিজের বাড়ি হবে।

কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে সিরাজুল তাকিয়ে রইলেন।

অবনী বলল, মামলার রায় বেরুবে সামনে সপ্তাহে। আমরা জিতবই। তারপর এ বাড়ি নিয়ে কী হবে, সেটাই সমস্যা। আর ঠিক দেড় মাস পরেই আমি চলে যাচ্ছি আমেরিকা। তখন কে দেখবে? মাকে কলকাতায় নিয়ে রাখব। আমরা এখানকার পাট তুলে দিতে চাই! আপনারা বাড়িটা নিয়ে নিন। এখানে এসে মাঝে মাঝে থাকবেন।

সিরাজুল এক গাল হেসে বললেন, তা হয় নাকি? আমরা অন্য দেশের নাগরিক, অন্য দেশে প্রপার্টি রাখতে পারি না।

অবনী বলল, বাংলদেশের লোক আমেরিকা কিংবা ইংল্যান্ডে বাড়ি কিনতে পারে না?

সিরাজুল বললেন, তা পারে। কিন্তু এখানে সম্ভব নয়। আপনাদেরও একই ব্যাপার। ইন্ডিয়ানরাও ইওরোপ-আমেরিকায় বাড়ি কিনতে পাবে, কিন্তু বাংলাদেশে পারবে না। এই রকমই তো ব্যাপার।

অবনী বলল, তাই বুঝি! জানতাম না। আমাকে আপনি বলছেন কেন, তুমি বলুন। চলুন, একবার ছাদে যাবেন? রেললাইন এখনও দেখা যায়।

সিরাজুল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন।

মিন্টু বলল, দুলাভাই আপনার পক্ষে কি অত সিঁড়ি ভাঙা উচিত হবে?

সিরাজুল উৎসাহের সঙ্গে বললেন, আস্তে আস্তে উঠব। একবার দেখে আসি।

অবনীর পাশ দিয়ে উঠতে উঠতে রেহানা জিজ্ঞাসা করল, আপনি আমেরিকায় কোথায় যাচ্ছেন?

অবনী বলল, বোস্টনে। একটা স্কলারশিপ পেয়েছি, এমআইটি'তে জয়েন করব।

মিন্টু বলল, খুকিও তো যাচ্ছে। তবে, ও অন্য জায়গায়, বাফেলো। ওখানে পিএইচডি করবে।

দো-তলায় একটা টানা বারান্দা। পর পর ঘর। একটি ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক বৃদ্ধা। সাদা শাড়ি পরা, মাথার চুল সব সাদা, ফর্সা রঙ, মুখে অনেক ভাঁজ। মাথায় অর্ধেক ঘোমটা।

অবনী বলল, আমার মা।

সিরাজুল অস্ফুট স্বরে বললেন, আশ্চর্য, আমার মায়ের সঙ্গে অদ্ভুত মিল। চমকে উঠেছিলাম। যেন আমার মা-ই দাঁড়িয়ে আছেন।

অবনী সকলের সঙ্গে মায়ের পরিচয় করিয়ে দিল।

মিন্টু আর রেহানা সালাম জানাল।

আবেগের আতিশয্যে সিরাজুল এগিয়ে গিয়ে অবনীর মায়ের পা ছুঁয়ে কদমবুসি করে ফেললেন।

অবনীর মা সসঙ্কোচে বললেন, এ কী, এ কী, থাক থাক!

সিরাজুল বললেন, মাসিমা, আপনার নিশ্চয়ই নারায়ণগঞ্জের কথা মনে আছে? একবার চলেন না সেখানে।

অবনীর মা বললেন, আমার দু'পায়ে রাত। আর চলাফেরার সাধ্য নেই। নিচেই নামতে পারি না।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নারায়ণী বলল, আমার একবার বাংলাদেশ দেখে আসতে খুব ইচ্ছে করে।

তার গলার স্বর এখন নরম।

রেহানা তার বাবার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল।

সিরাজুল নারায়ণীকে অগ্রাহ্য করে অবনীর মাকে বললেন, প্লেনে গিয়ে উঠবেন আর নামবেন। এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি করে নিয়ে যাব। কোনও অসুবিধে হবে না।

অবনীর মা বললেন, তা আর হবে না। আপনারাই এ বাড়িতে কয়েকটা দিন থেকে যান। কত ঘর খালি পড়ে আছে।

সিরাজুল ভদ্রতা করে বললেন, সম্ভব হলে নিশ্চয় থাকতাম। কিন্তু আমার শরীর ভাল না, ফিরে যেতে হবে। আপনাদের নারায়ণগঞ্জের বাড়িটা ঠিকঠাকই আছে।

অবনীর মা আর কোনও কথা না বলে তাকিয়ে রইলেন। যেন তার দৃষ্টি সুদূরে চলে গেছে। অতীতে, কিংবা শেষ দিনগুলির ও-পারে।

ছাদের সিঁড়ির দিকে ফিরে আসতে আসতে আর একটা ঘরের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে সিরাজুল বললেন, এই ঘরখানায় আমার বড় আপার বিয়ে হয়েছিল। আমার তখন তিন-চার বছর বয়েস, স্পষ্ট মনে পড়ছে, দুই হাতে মেহেন্দির ছাপ দেওয়া হয়েছিল। আমার আর দুই বোন, এখন বেঁচে নাই, মুখ দেখতে পাচ্ছি।

ছাদ থেকে দেখা যায় বাড়ির পেছন দিকে অনেকখানি মাঠ ও জলাভূমি, তার মাঝখানে রেললাইন। একটু দূরে সেই বটগাছ। এমনকিছু আহামরি দৃশ্য নয়। কাশফুল এখন ফোটেনি।

ঠিক সেই সময়েই একটা ট্রেন এল।

সিরাজুল হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন, ওই যে ওই যে, দেখ, ট্রেন যাচ্ছে।

রেহানা বলল, মুসাফির, তুমি যে একেবারে বাচ্চা হয়ে গেলে!

সিরাজুল বললেন, তাই বোধহয় হয়ে গেছি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বোধহয় একটু একটু অপু চরিত্রটা থাকে। ট্রেনটা দেখে বাচ্চা বয়সের মতোই আনন্দ হল।

আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে। আর ছাদে থাকা যায় না। কিন্তু সিরাজুল যেতে চাইলেন না। এক দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওইখানে দুটো বাতাবি লেবুর গাছ ছিল। এখনও একটা আছে দেখছি।

রেহানা বলল, ওই গাছ কি অত দিন বাঁচে? ওটা নিশ্চয়ই অন্য একটা নতুন গাছ।

সিরাজুল তবু জোর দিয়ে বললেন, না না, নতুন না, কত বড় দেখছিস না, সে-আমলেরই। মানুষ কত কথা ভুলে যায়, কিন্তু গাছ মনে রাখে। ওই গাছটা কি আমাকে মনে রেখেছে?

.

০৪.

ঠিকানা দেওয়া-নেওয়া হয়েছিল, চিঠি লেখা ও আবার দেখা হবার প্রতিশ্রুতি বিনিময় হয়েছিল। কিন্তু সে-সব আর পরে মনে থাকেনা।

সিরাজুলরা ফিরে গিয়ে চিঠি দেননি। অবনীও বিদেশে যাবার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে মামলায় সে জিতেছে, তবুও বাড়ি জবরদখলের সম্ভাবনা রয়েই গেল। মাকে সে নিয়ে এসেছে কলকাতার ফ্ল্যাটে। অবনী বিয়ে করেনি, তার অনুপস্থিতিতে এক মামাতো ভাই সস্ত্রীক এই ফ্ল্যাটে থেকে মায়ের দেখাশুনো করবে।

কিছুদিন আগে একবার সে ভেবেছিল, খুড়তুতো ভাইদের সে ও-বাড়িটা ব্যবহার করতে দিতে রাজি হয়ে যাবে। কিন্তু ওরা মামলা করার পর আর সে প্রশ্ন ওঠেনা। মামলার সময় তারা অবনীকে অকথ্য-কুকথ্য গালিগালাজ করেছে। বলরাম চৌধুরীর বেশি বয়সের সন্তান অবনী, কিন্তু ওরা ইঙ্গিত করেছিল, অবনী আসলে বলরামের ছেলেই নয়, তার জনক অন্য কেউ। এটা অবনীর মায়ের চরিত্র সম্পর্কেও কুৎসিত অপবাদ। তাই অবনীর জেদ চেপে গেছে, ও-বাড়ি সে জলের দরে বেচে দেবে, তবু সে খুড়তুতো ভাইদের ও-বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেবে না।

আপাত সে বাড়ি পাহারা দেবার জন্য এক জন নেপালি দারোয়ান নিযুক্ত করেছে।

মাকে ফেলে রেখে বিদেশে চলে যেতে হবে, সেজন্য অবনীর মনে খানিকটা খুঁতখুঁতুনি ছিল। কিন্তু মা-ই তাকে যেতে বলছেন বার বার। মা যেন তার জীবন থেকে সব চাওয়া-পাওয়া ঝেড়ে ফেলেছেন। বার বার বলেছেন, তার কোনও অসুবিধে হবে না। টেলিফোনে তো কথা হবেই।

যাবার আগের কয়েকটা দিন অবনী তার মায়ের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে চায়।

মা যশোরের মেয়ে। বিয়ের পর গিয়েছিলেন নারায়ণগঞ্জ। তা-ও খুব বেশিদিন সেখানে থাকেননি। স্বামীর সঙ্গে তার বয়সের বেশ তফাৎ ছিল।

মায়ের মুখে পুরনো কথা বিশেষ শোনেনি অবনী।

সিরাজুল সাহেবরা ঘুরে যাওয়ার পর হঠাৎ যেন মায়ের স্মৃতির দরজা খুলে গেছে। বলতে শুরু করেছেন শ্বশুর-শাশুড়ির কথা। ঠাকুর্দা-ঠাকুমাকে চোখেই দেখেনি অবনী, তাদের ছবিও নেই। নারায়ণগঞ্জের বাড়িটা প্রায় শীতলক্ষা নদীর ধারে, বড় বাগান ছিল। আগে দু'একবার অবনী শুনেছে, মা শ্বশুর বাড়ির চেয়ে বাপের বাড়ি বেশি পছন্দ করতেন। নারায়ণগঞ্জের চেয়ে যশোর অনেক বেশি সুন্দর শহর। সেই তুলনায় নারায়ণগঞ্জ ঘিঞ্জি, সবসময় লোকজনের চ্যাঁচামেচি। এখন মা নারায়ণগঞ্জের বাড়িটার কথাই বলতে লাগলেন বার বার। একবার একটা ব্রত উপলক্ষে তিনি চাপাগাছের চারা পুঁতেছিলেন নিজের হাতে। সেই গাছটাকে বড় হতে দেখেছেন, ফুল ফোঁটার আগেই অবশ্য সেবাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয়। সেই গাছটা এখনও আছে কি না কে জানে!

মা বললেন, তুই তো একবার বাড়িটা দেখতে গেলেও পারিস!

অবনী বলল, এখন সময় কোথায়? দেখি যদি ফিরে আসার পর- ।

আমেরিকায় যাবার পথে ঢাকার অবশ্য থামতে হল অবনীকে।

বাংলাদেশ বিমানের টিকিট, কলকাতা থেকে উড়তে না-উড়তেই পৌঁছে গেল ঢাকা। পরবর্তী ফ্লাইট সাড়ে তিন ঘণ্টা পর, এই সময়টা কাটাতে হবে ট্রানজিট লাউঞ্জে।

পৃথিবীর সব দেশের এয়ারপোর্ট প্রায় একই রকম। কোনওটা বেশি বড়, কোনওটা তুলনায় ছোট। ট্রানজিট লাউঞ্জ থেকে বাইরে বেরুতে দেবেনা, শহরটাও দেখা যাবে না।

বসে বসে তন্দ্রা এসে গিয়েছিল অবনীর, হঠাৎ একটা ঘোষণা শুনে সে চমকে উঠল। কিছু একটা যান্ত্রিক গোলযোগে পরবর্তী বিমান ছাড়তে অনেক দেরি হবে, ট্রানজিট প্যাসেঞ্জারদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে হোটেলে।

অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে একটা বাসে তুলে দেওয়া হল অবনীকে। রাত প্রায় এগারোটা। বড় বড় রাস্তা, ঝকঝক করছে আলল, এ ছাড়া শহরের আর কিছু দেখার নেই। দোকানপাটও সব বন্ধ।

কলেজের ছাত্র অবস্থায় একবার ক্রিকেট টিমের সঙ্গে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গিয়েছিল অবনী। বিদেশযাত্রা তার কাছে একেবারে নতুন নয়। বিদেশের হোটেলেও থেকেছে। মাঝারি ধরনের হোটেল সব জায়গায় এক।

ভোরবেলায় আবার তুলে নিয়ে যাওয়া হবে তাদের। অবনী দাঁত-টাত মেজে তৈরি হয়ে রইল। কেউ এল না। একটু বেলা হবার পর জানা গেল, আরও একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে তাদের। হোটেলের খরচ বিমান কোম্পানিই দেবে।

পুরো একটা দিন তাকে কাটাতে হবে ঢাকায়। এখানকার কারুকেই সে চেনে না। তখন তার মনে পড়ল নারায়ণগঞ্জের কথা। নারায়ণগঞ্জ কত দূরে? হোটেলের এক জন বেয়ারার কাছে জিজ্ঞেস করে সে জানল, নারায়ণগঞ্জ বেশ কাছেই দশ-বারো মাইলের দূরত্ব। ঢাকা আর নারায়ণগঞ্জকে টুইন সিটি বলা যায়, অনবরত লোকজন যাতায়াত করছে।

যাঃ, সিরাজুল চৌধুরীর ঠিকানা লেখা কাগজটা তো সে আনেনি!

হোটেলটা শহরের কেন্দ্রস্থলে। বাইরে বেরিয়ে খানিকটা ঘুরে এল অবনী। বড় বড় সব বাড়ি, ঝলমলে দোকান, কলকাতার চেয়েও সুদৃশ্য মনে হয়। তবে বড় বেশি সাইকেল রিকশা, ট্রাফিকও খুব বিশৃঙ্খল।

একা একা নতুন কোনও জায়গায় ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে না। তাছাড়া অবনীর মনটা আমেরিকার চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে আছে। বোস্টনে তার এক দাদার বন্ধু থাকে, তার এয়ারপোর্টে রিসিভ করার কথা ছিল। সে এসে ফিরে গেছে। তাকে একটা ফোন করতে হবে, কিন্তু পরের ফ্লাইট ঠিক কখন যাবে, তাই-ই যে এখনও নিশ্চিত করে জানা যাচ্ছে না।

দিনেরবেলা শুধু শুধু ছোটলের ঘরে বসে থাকতেও খুব খারাপ লাগে। একটা গাড়ি ভাড়া করে অনায়াসে নারায়ণগঞ্জ ঘুরে আসা যেত। বর্ধমানের তালিত একটা ছোট জায়গা, সেখানে সিরাজুল চৌধুরীরা যেভাবে বাড়ি খুঁজে পেয়েছিলেন, সেভাবে কি নারায়ণগঞ্জে বাড়ি খুঁজে পাওয়া সম্ভব? তাছাড়া সিরাজুল চৌধুরীর কিছুটা স্মৃতিও ছিল।

সিরাজুল চৌধুরীর শ্যালক মিন্টু একজন নামকরা কবি। কিন্তু কী যেন তার ভাল নামটা? একেবারেই মনে পড়ছে না। মুসলমানদের নাম একবার-দু'বার শুনলে মনে রাখা শক্ত। কারণ মানে বোঝা যায় না, শব্দগুলোও পরিচিত নয়। অমল, কমল, বিমল কিংবা অভিজিৎ, অনির্বাণ, রণজয় ধরনের নামগুলি চোখ বা কানে বহুপরিচিত। সেই তুলনায় ইফতিকার, আনোয়ারুল, ইমতিয়াজ বা খন্দকার যেন নিছক শব্দ। মুসলমানরা নিশ্চয়ই মানে বোঝে, হিন্দুরা বোঝে না। ওদের ওই সবনাম পৃথিবীর যে-কোনও দেশের মানুষের হতে পারে, বাঙালি বলে আলাদা ভাবে চেনার উপায় নেই।

সকালে ঘরে একটা ইংরিজি ও একটা বাংলা কাগজ দিয়েছিল। তাতে চোখ বোলাতে গিয়ে অবনী লক্ষ্য করেছে, কেউ কেউ নিজেদের বাঙালিত্ব বোঝাবার জন্য আরবি নামের শেষে মিলন, মুকুল, মিন্টু, বাবু এই সব জুড়ে দিয়েছে। এগুলো বোধহয় এঁদের ডাকনাম।

সিরাজুল চৌধুরীর নামটা তার মনে আছে অবশ্য। তার কারণ সিরাজ নামটা কোন না বাঙালি জানে? তবে সিরাজুল চৌধুরীও যে ছদ্মনামে কিছু লেখেন, তা সে জানে না।

হোটেলের লবিতে একটা ছোট বইয়ের দোকানও আছে। দোকানের কর্মচারীটির সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে দু'জন যুবক। অবনী সেখানে গিয়ে কয়েকটা বইয়ের পাতা উলটে দেখল, তারপর খুব সংকোচের সঙ্গে ওদের জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা কিছু মনে করবেন না, বোকার মতো একটা প্রশ্ন করছি, আপনাদের এখানে একজন কবি আছেন, নামটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না, তবে মিন্টু বলে তাকে অনেকে চেনে।

অবনী আর কিছু বলার আগেই ওদের এক জন বলল, আবদুল কাদের। তার বই চান? আপনি ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন?

অবনী মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। ওঁর সঙ্গে আমার একবার পরিচয় হয়েছিল। ঠিকানা জানি না, একবার দেখা করার ইচ্ছা ছিল।

ওদের এক জন বলল, মিন্টুভাই এলিফ্যান্ট রোডে থাকেন না?

আর এক জন বলল, ইত্তেফাকে আছেন, সেখান থেকেই তো জানা যায়।

নিজেরাই উৎসাহ করে ইত্তেফাক পত্রিকা অফিসে ফোন করল। সেখানে জানা গেল, আবদুল কাদের ছুটিতে আছে, তার বাড়ির ফোন নম্বর পাওয়া গেল।

সেই নম্বরে ফোন করার পর এক জন মহিলা বললেন, আসসালামু আলাইকুম।

কথাটা এত দ্রুত বলা হল যে অবনী কিছুই বুঝল না। সে জিজ্ঞেস করল, আবদুল কাদের সাহেব আছেন?

জি না। এখন বাসায় নাই।

কখন ফিরবেন?

আপনি কে বলছেন?

আমি ইন্ডিয়া থেকে এসেছি। ঠিক আছে, আমি পূর্বাণী হোটেলে আছি, পরে ফোন করব।

আপনার নামটা বলেন, লিখে রাখব।

আমার নাম অবনী চৌধুরী।

কী নাম বললেন?

অবনী আর একবার নিজের নাম বলতেই সেই মহিলাটি বললেন, আপনি হোটেলের লবিতে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। কাদের সাহেবকে খবর দিচ্ছি, তিনি পৌঁছে যাবেন।

অবনী আবদুল কাদেরের একটি কবিতার বই কিনে এক জায়গায় বসে পড়তে শুরু করে দিল।

সে বিজ্ঞানের ছাত্র, খেলাধুলাতেই উৎসাহ ছিল বেশি, সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নেই। গল্প উপন্যাস তবু কিছু পড়েছে, শখ করে কবিতা পড়েনি কখনও। আবদুল কাদেরের কবিতাগুলি দুর্বোধ্য নয়, বেশ বোঝা যায়।

একটা ব্যাপারে সে খুব বিস্মিত হয়েছে। শুধু ডাকনাম শুনেই এরা একজন কবিকে চিনে ফেলল? কবিরা এখানে এত জনপ্রিয়? কিংবা এমনও হতে পারে, বইয়ের দোকনে যে ছোকরা দুটি দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও কবিতা লেখে।

সে যাই হক, মিন্টু অর্থাৎ আবদুল কাদের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি অবনীর মতো একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করার জন্য হোটেলে আসবেন কেন? অবনীরই যাওয়া উচিত তাঁর বাড়িতে। মহিলার কাছ থেকে বাড়ির ঠিকানাটা জেনে নিলেই হত।

মাঝে মাঝে হোটেলের প্রবেশ পথটার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে অবনী। হঠাৎ এক সময় তার বুকটা ধক করে উঠল। মিন্টু নয়, তার মেয়ে রেহানা আসছে দ্রুত পায়ে।

বর্ধমানে সে রেহানাকে দেখেছিল সালোয়ার-কামিজ পরা অবস্থায়। মনে হয়েছিল, ছোটখাটো চেহারা। মুখে রাগী রাগী ভাব। আজ সে পরে আছে একটা ঘি রঙের শাড়ি, মাথার চুল খোলা, যেন অন্য রকমের এক পূর্ণ যুবতী।

রেহানা চঞ্চল চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজতে লাগল, অবনী বসেই রইল চুপ করে। তাকে দেখতে পেয়ে রেহানা কাছে এগিয়ে এসে ধমকের সুরে বলল, ঢাকায় এসেছেন, আগে খবর দেননি?

অবনী বলল, এখানে থাকার কথা ছিল না। বিমানে কী যেন গণ্ডগোল হয়েছে।

রেহানা বলল, চলুন, উঠুন, উঠুন!

কোথায় যাব?

আপনার ফ্লাইট কোন সময়?

সম্ভবত আজ রাত্তিরে।

অনেক সময় আছে। উঠুন।

এত ভাল ভাল বিদেশি গাড়ি কলকাতায় কেন, ভারতের কোথাও দেখা যায় না। রেহানা তাকে তুলল একটা বড় জাপানি গাড়িতে। এক জন কবির মেয়ে এমন দামি গাড়িতে চড়ে? ড্রাইভারের পরিষ্কার সাদা উর্দি।

ড্রাইভারকে কিছু একটা নির্দেশ দিয়ে রেহানা অবনীর দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলল, এখানে আপনাকে বাগে পেয়েছি। আর ছাড়ছি না। আপনার ওপর আমার রাগ আছে। আজ আপনার ফ্লাইট মিস করাব!

অবনী বলল, সে কী! আমি কী দোষ করেছি?

রেহানা বলল, আপনি আমাদের শান্তিনিকেতন যেতে দেননি! শান্তিনিকেতন না দেখে শুধু বর্ধমান দেখে এসেছি, তা শুনলে এখানকার মানুষ হাসে।

সে-দিন খিচুড়ি রান্নার পর খেতে খেতে বেলা তিনটে বেজে গিয়েছিল। তারপর নামল তুমুল বৃষ্টি। তার মধ্যে বেরুনো যায় না। বসে বসে গল্প হয়েছিল শেষ-বিকেল পর্যন্ত।

শান্তিনিকেতনের প্রোগ্রাম ক্যানসেল করতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। অবনীরও সে-দিন ফেরার কথা। ওদের সঙ্গেই বর্ধমান এসে, একই ট্রেনে ফিরেছিল কলকাতায়।

শান্তিনিকেতন তো এর পরেও একবার এসে দেখে যেতে পারেন।

একবার কেন, একশো বার যেতে পারি। কিন্তু সেবারই আমার দেখার ইচ্ছে ছিল, সেই জন্যই বেরিয়েছিলাম। আপনি খিচুড়ি খাওয়াবার নাম করে আমাদের দেরি করালেন।

এক্সট্রিমলি সরি। খিচুড়ি যে আপনার একেবারে পছন্দ নয়, তা বুঝতে পারিনি।

সেকথা হচ্ছে না। খিচুড়িটা ইম্‌মেটিরিয়াল, দেরিটাই আসল।

পরে যে অত বৃষ্টি নামবে, সে ব্যাপারে আমার হাত ছিল না।

আপনি শহিদ মিনার দেখেছেন? সাভারের স্মৃতিসৌধ দেখেছেন?

আমি তো বাংলাদেশে আগে আসিনি। কিছুই দেখিনি।

ও-সব কিছু আপনাকে দেখাব না। নারায়ণগঞ্জের একটা পুরনো শ্যাওলাধরা বাড়ির মধ্যে আপনাকে ঠেসে রাখব। আপনি যেমন বর্ধমানে আমাদের রেখেছিলেন।

আমরা কি এখন নারায়ণগঞ্জে যাচ্ছি? সিরাজুল চৌধুরী সাহেব কি সেখানে? তার সঙ্গে দেখা হলে ভাল লাগবে।

আমার বাবাও সেখানে।

ঢাকা শহর ক্রমশই বাড়ছে। গাড়ির সংখ্যাও প্রচুর। মাঝে মাঝেই যানজট, গাড়ি থেমে থাকে কিছুক্ষণ। গরম অবশ্য নেই। তাছাড়া এ গাড়িটা এসি।

অধিকাংশ দোকানের নাম বাংলায় লেখা। এমনকী ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপনও বাংলায়, এ-সব অবনীর চোখে অভিনব লাগে।

নারায়ণগঞ্জে পৌঁছতে দূরত্বের তুলনায় অনেকটা বেশি সময় লাগল।

গাড়ি থেকে নেমে প্রথম দর্শনে অবনী তাজ্জব বনে গেল। এত বড় বাড়ি? মনে হয় যেন দু'মহলা। রেহানা বলেছিল, শ্যাওলাধরা, বাইরের দিকে অন্তত সে-রকম কোনও চিহ্নই নেই।

এ বাড়ির সঙ্গে বর্ধমানের বাড়িটার কোনও তুলনাই হয় না। এটাকে মনে হয়, রীতিমতো কোনও ধনীর বাড়ি। গেটে দারোয়ান রয়েছে।

প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় অবনীর মনে হল, এক্সচেঞ্জের ব্যাপারে তার বাবা খুব ঠকে গিয়েছিলেন। এই বাড়ির বদলে বর্ধমানের ওই বাড়ি কেউ নেয়? বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছিল।

বাড়িভর্তি অনেক লোক।

গেট দিয়ে ঢুকে, একটা লন পেরিয়ে প্রশস্ত বৈঠকখানায় পাওয়া গেল সিরাজুল ও মিন্টুকে। অন্য দু'জন ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে তারা কী সব বৈষয়িক ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রেহানা বলল, আব্বু, দেখো, কাকে ধরে এনেছি।

মিন্টু মুখ তুলে বলল, আরেঃ! সারপ্রাইজ! সারপ্রাইজ! কোথায় পেলি একে?

সিরাজুল বললেন, অবনী? এসো, এসো, ওয়েলকাম হোম!

একটু পরেই চা এল, তার সঙ্গে একটা বড় প্লেটভর্তি বিস্কুট আর মিষ্টি। তারপর অগণিত মানুষের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেওয়া হল। কেউ নানির মেয়ে, কেউ ফুফার ছেলে, কেউ বড় আপা।

নানী, ফুফা ঠিক কাদের বলে, তা অবনী জানে না। তবে আপা মানে দিদি, তা সে জনে, আর দাদাকে এরা বলে ভাই। এত আত্মীয়-স্বজন এই বাড়িতেই এক সঙ্গে থাকে, না কোনো উৎসব উপলক্ষে এসেছে, তা ঠিক বোঝা গেল না।

প্রথম দেখা হলে সকলেই একটা হাত বুকের কাছে খানিকটা তুলে বলে, সেলাম আলেকুম। এটাই সম্বোধন। কিন্তু সবাই খুব তাড়াতাড়ি বলে কেন? অবনীর বয়সী পশ্চিম বাংলার ছেলেরা আজকাল আর সচরাচর হাতজোড়ও করেনা, নমস্কার কথাটাও উচ্চারণ করে না। এমনিই কথা শুরু করে।

এদের এইভাবে সম্বোধনের উত্তরে কী করা উচিত, তা বুঝতে না পেরে অবনী বেশ অস্বস্তিতে রইল।

গল্পের বইতে সে পড়েছে, মুসলমানরা প্রথম সম্বোধনে আদাব বলে। এখানে আদাব শব্দটা সে কারুকেই ব্যবহার করতে শোনেননি!

চা শেষ করার পর সিরাজুল বললেন, চলো, তোমাদের আসল বাড়িটা দেখিয়ে আনি। সামনের পোরশানটা নতুন, খানিকটা জমি কিনে আমরা বাড়িয়েছি!

বাবা ঠকে গেছেন, এই রকম একটা চিন্তা নিয়ে অবনীর ভেতরে খানিকটা ক্ষোভ জমেছিল। এবার সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বাড়িটা আদতে এত বড় ছিল না, জমিও ছিল না এতটা। তাছাড়া সিরাজুল সাহেবরা এটাকে বসতবাড়ি করে রেখেছেন, বর্ধমানের বাড়িটার সেরকম ব্যবহার হয়নি অনেক দিন।

পেছন দিকে একটা উঠোন, তারও দিকের বাড়িটার গড়নই পুরনো ধরনের। মোটা মোটা দেওয়াল। এক তলায় অনেকখানি খোলা বারান্দা, যা এখন অপ্রয়োজনীয়। আগেকার কালে বাড়ির মহিলারা ওখানে বসে তরকারি কুটতেন বোধহয়।

এ বাড়ির দেওয়ালে কিছু কিছু শ্যাওলার ছোপ আছে।

সিরাজুল বললেন, পুরনো বাড়িটাই আমার বেশি ফেভারিট। দোতলার জানলা দিয়ে শীতলক্ষা নদী দেখা যায়। আমি সেই ঘরেই থাকি।

অবনীর কিছুই রোমাঞ্চ হচ্ছে না। এখানে সে জন্মায়নি। তার বাবা-মা এখানে ঘুরে বেড়াতেন, সে কল্পনা করার চেষ্টা করছে। উঠোনে একটা তুলসিমঞ্চ রয়েছে, গাছটা নেই। একেবারে খালি। ওখানে মা প্রতি সন্ধেবেলা প্রদীপ জ্বালতেন?

মায়ের নিজের হাতে পোঁতা চাপা গাছটা কি এখন আছে?

সেকথা জিজ্ঞেস করতেই সিরাজুল বললেন, একটা চাপাগাছ ছিল বটে, অনেক ফুল ফুটত। আমি ছোটবেলায় দেখেছি। একবার খুব ঝড়ে সেই গাছটা পড়ে যায়।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে মিন্টু বলল, দুলাভাই, বর্ধমান গিয়ে দেখার পর বুঝলাম, সম্পত্তি বদলাবদলি করে আপনারাই জিতেছেন।

সিরাজুল বললেন, কেন? দুটো বাড়ির সাইজ প্রায় সমান সমান। উনিশ-বিশ!

মিন্টু বলল, তা হতে পারে। কিন্তু পোজিশান? বর্ধমানের ওই তালিত নিতান্তই মফঃস্বল। সে-তুলনায় নারায়ণগঞ্জ অনেক জমজমাট। এখান থেকে ঢাকা যাওয়া-আসাও অনেক সহজ।

সিরাজুল বললেন, পার্টিশনের সময় এখান থেকে ঢাকাও বেশ দূর মনে হত। তখন তো এত মোটরগাড়ি ছিল না। আমরা যেতাম নৌকায়।

দুপুরে খাওয়ার টেবিলে বসে অবনীর চক্ষু চড়ক গাছ।

একটা লম্বা টেবিল ভর্তি বিভিন্ন আকারের পাত্রে কত রকম যে খাদ্যদ্রব্য সাজানো, তার ঠিক নেই।

খাবে মাত্র চার জন, সিরাজুল, তার একবড় ভাই গনি সাহেব, মিন্টু আর অবনী।

রেহানা আর একজন মহিলা পরিবেশন করবেন।

অবনী বসার বদলে চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে আছে দেখে রেহানা বুঝিয়ে দিতে লাগল কোনটা কী।

টাকিমাছের শুঁটকি, শাক-শুঁটকি, আলুভাজা, বেগুনভাজা, দু'রকম ডাল, কই মাছ, চিতল মাছের পেটি, বড় বড় গলদা চিংড়ি, দু'রকম মাংস, চাটনি, দই, তিন রকম মিষ্টি...।

সিরাজুল বললেন, বিফ নেই, চিন্তা করো না, আমি আগেই বলে দিয়েছি।

অবনী বলল, সেটা চিন্তার বিষয় নয়। কলেজে পড়ার সময় আমরা নিয়মিত নিজামের দোকানের বিফ রোল খেয়েছি। কিন্তু...এত খাবার কি মানুষে খেতে পারে?

রেহানা বলল, ও-সব শুনবনা। প্রত্যেকটা আপনাকে খেতে হবে।

অবনী একেবারে মরমে মরে গেল। ছি ছি ছি, তাদের বাড়িতে এই অতিথিদের সে খিচুড়ি, বেগুনভাজা, ডিমভাজা আর একটা করে পার্শে মাছ ছাড়া আর কিছু খাওয়াতে পারেনি। আগে থেকে ব্যবস্থা ছিল না, অত বেলায় তালিতের বাজারে ভালো মাছও পাওয়া যায় না।

রেহানার ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি।

অবনী অত সামান্য খাবার আয়োজন করেছিল বলেই যেন রেহানা তার প্রতিশোধ নিতে চাইছে।

এত কম সময়ের মধ্যে এত পদ রান্না হল কী করে? এরা কি প্রত্যেক দিনই এত রকম জিনিস খায়?

শুঁটকি মাছ আগে কখনও খায়নি অবনী। শুনেছে, ওতে খুব বদগন্ধ থাকে। তবে কোনও খাদ্য সম্পর্কেই তার মনে কোনও পূর্ব-সংস্কার নেই, সব কিছুই সে চেখে দেখতে রাজি আছে।

একটুখানি শুঁটকি মাছ সে মুখে তুলে দেখল, কোনও গন্ধ নেই তো!

তার ভয় ভয় ভাবটা দেখে সিরাজুল বললেন, শুঁটকি মাছ রান্না হলে আর গন্ধ থাকে না। কেমন লাগল?

অবনী বলল, বেশ নতুন ধরনের। আর একটু খাব।

তারপর সে মনের কথাটা বলেই ফেলল। সিরাজ সাহেব, আমাদের বাড়িতে আপনাদের কিছুই খাওয়াতে পারিনি। সে-রকম ব্যবস্থা ছিল না। তবু আপনাদের জোর করেছিলাম!

সিরাজুল বললেন, কী বলো! খিচুড়ি আমার দারুণ ফেভারিট! প্রায়ই খাই। তাছাড়া পার্শে মাছ ছিল, কত দিন পর খেলাম। ও-মাছটা আবার এ-দিকে পাওয়া যায় না।

মিন্টু বলল, খিচুড়ির কী চমৎকার স্বাদ হয়েছিল। আমাদের বাড়িতে অত পাতলা খিচুড়ি বানাতে জানে না, বেশি ঘন হয়ে যায়।

অবনী বুঝল, এ-সবই ভদ্রতার কথা। এঁরা আবার পশ্চিম বাংলায় বেড়াতে গেলে... কিন্তু সে আর কবে হবে? আগামী দু'বছরের মধ্যে অন্তত তার আমেরিকা থেকে ফেরা সম্ভব নয়।

রেহানা বলল, আপনি পাঙাস মাছ খেয়েছেন?

অবনী ও-মাছের নামও শোনেনি। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় কিছু কিছু মাছের নাম আলাদা। মায়ের মুখে সে বাঁশপাতা, চ্যালা, ভ্যাদা এই সব নাম শুনেছে, পশ্চিম বাংলায় ও-রকম নামের চল নেই।

সে দুদিকে মাথা নাড়ল।

রেহানা বলল, রাত্তিরে আপনাকে পাঙাস খাওয়ানো হবে। খুব মজার খেতে লাগে।

অবনী বলল, রাত্তিরে? আমাকে তো বিকেলেই চলে যেতে হবে। রাত্তিরে আমার ফ্লাইট।

রেহানা বলল, আপনার ফ্লাইট কাল বেলা এগারোটার আগে যাবেনা। আরও দেরি হতে পারে। রাত্তিরে আপনি এখানেই থেকে যাবেন। আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না।

অবনী প্রায় আঁতকে উঠে বলল, না না, আমাকে ফিরতেই হবে। ফ্লাইট মিস করলে...আপনি কী করে জানলেন, কাল এগারোটার আগে ফ্লাইট যাবে না?

রেহানা বলল, জানা খুব সোজা। টেলিফোন করলেই জানা যায়! আপনাদের কলকাতার মতো তো নয় যে, এয়ারপোর্টে ফোন করলে কেউ ধরেই না।

মিন্টু বলল, সব খবর নেওয়া হয়ে গেছে। বিমানে আমার এক বন্ধু কাজ করে। কোনও চিন্তা নেই, সে ঠিক সময় আমাদের জানাবে।

সিরাজুল বললেন, সন্ধ্যার সময় এখানকার কিছু গণ্যমান্য লোককে ডেকেছি। তোমাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। তুমি তো এখানকারই সন্তান। নারায়ণগঞ্জের এক কৃতী সন্তান উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকা যাচ্ছে, এ তো আমাদেরও গর্ব।

অবনী বলল, কী যে বলেন! হাজার হাজার ছেলে মেয়ে বিদেশে যায়, এটা আবার কোনও ব্যাপার নাকি! এই রেহানাও তো যাচ্ছেন শুনলাম। বরং ওঁকে সম্বর্ধনা দিন।

রেহানা বলল, আমাকে কেন? আমি মেয়ে বলে?

মিন্টু বলল, আমাদের এখান থেকে অনেক মেয়েও পিএইচডি করতে গেছে। তবে জেনেটিক্সের মতো সাবজেক্ট নিয়ে ওর মতো এত ভাল রেজাল্ট আগে কেউ করেনি।

রেহানা বাবার দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, তুমি খবরদার ওইসব কথা বলবে না লোকের সামনে।

সব কটা পদ একটু একটু করে খেলে দারুণ পেট ভরে যায়। অবনীর মনে হল, জীবনে কখনও সে এত বেশি খায়নি।

খাওয়ার পর সিরাজুল প্রস্তাব দিলেন অবনীকে খানিকটা বিশ্রাম নিতে। একটা ঘর তার জন্য রেডি করা আছে। সে ঘুমিয়েও নিতে পারে।

অবনীর দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যেস নেই। ভেতরে ভেতরে সে অস্থির বোধ করছে খুব। সত্যিই কি তার বিমান কাল এগারোটার আগে ছাড়বেনা? নাকি এরা প্র্যাকটিক্যাল জোক করছে তার সঙ্গে। সে নিজে একবার টেলিফোনে জেনে নিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারত। কিন্তু এদের মুখের ওপর অবিশ্বাসই-বা করে কী করে!

রেহানার ঠোঁটে চাপা হাসিটাই সন্দেহজনক। বিশ্রাম নেবার প্রস্তাবটা না মেনে সে বলল, আমি বরং চারপাশটা ঘুরে টুরে দেখি!

সিরাজুল চৌধুরীরও দুপুরে শোওয়ার অভ্যেস নেই। বাগানে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। বাড়ির পেছনে দিকে খানিকটা জায়গায় বেগুন ও লঙ্কার চাষ হয়েছে। বেশ নধর বেগুন ফলেছে, লঙ্কাগুলিও সূর্যমুখী।

অবনীকে বললেন, তোমার বাবার আমলে একজন লোক এখানে আছে এখন। সে তোমাকে পুরনো কিছু কথা বলতে পারবে। দাঁড়াও তাকে ডাকি। এক জন মালিকে বললেন, এই শশাকে একবার আসতে বল তো এখানে।

একটু পরেই লুঙ্গি গেঞ্জি পরা এক জন বৃদ্ধ এল সেখানে। শরীরটা বেঁকে গেছে খানিকটা, মাথায় ঠিক টাক নেই, খামচা খামচা করে চুল উঠে গেছে।

সিরাজুল বললেন, এর নাম শশধর, সবাই শশা বলে ডাকে। তোমার বাবার আমলেও এই বাড়িতে কাজ করত, এখনও করে।

শশা, তোমার বলরাম চৌধুরীকে মনে আছে তো? ইনি তেনার ছেলে। শশধর ফ্যাল ফ্যাল করে অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, হ, সব মন আছে। এনাকেও মনে আছে। ছুট ছিলেন, দুই তিন বছরের বাইচ্চা, আমি কোলে নিছি।

অবনী হাসল, এই বাড়ি বদলের আঠেরো বছর পর সে জন্মেছে কলকাতায়। এই মাটিতে সে আগে কখনও পা দেয়নি। এই লোকটি তাকে কোলে নিয়েছে?

সিরাজুল বললেন, যাঃ, তা কী করে হবে? সেই সময় বলরাম চৌধুরীর কোনও ছেলে-মেয়ে ছিল না।

এতেও দমে না গিয়ে শশধর বলল, ওই সইজনা গাছটার তলায় বইয়া বলরাম চৌঙ্গি তামুক খাইত। তেনার কোলে একটা শিশুরে দেখছি কতবার।

সিরাজুল বললেন, ওই সজিনা গাছটা আমাদের আমলের। আগে ছিল না।

শশধর বলল, দুর্গাপূজা হইত এ-বাড়িতে। কত ধুমধাম। একবার ছত্রিশটা রাজভোগ খাইছিলাম, তারপর মাটিতে গড়াগড়ি।

সিরাজুল হাসতে হাসতে বললেন, ছত্রিশটা রাজভোগ? এখনকার দিনে কেউ খেলে আর বাঁচবেই না।

দুর্গাপুজোর কাহিনিটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না অবনীর। সে তার মায়ের কাছে এ বিষয়ে কিছু শোনেনি।

সে জিজ্ঞেস করল, আপনার কি মনে আছে, এখানে একটা চাঁপা ফুলের গাছ ছিল? ঠিক কোন জায়গাটায়?

অবনী লক্ষ্য করেছে, কিছু কিছু শব্দে সামান্য উচ্চারণের পার্থক্য থাকলেও সিরাজুল-মিন্টু-রেহানাদের মুখের ভাষা আর তার নিজের ভাষা প্রায় একই রকম। এই শশধরের

মুখেই সে প্রথম কাঠ বাঙাল ভাষা শুনছে। শশধর সম্ভবত তার উচ্চারণ বুঝতে পারছে না।

অবনীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, অনেক গাছ আছিল, বোরোই গাছ, কদম গাছ, চাইলতা গাছ।

পঞ্চাশ বছরের স্মৃতি ক'জন ধরে রাখতে পারে? পুরনোও কথা শোনার কোনও রোমাঞ্চও বোধ করছে না অবনী।

সন্ধেবেলা সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হল না বটে, তবে ছোটখাটো একটা গান-বাজনার আসর বসল। স্থানীয় প্রতিভার অভাব নেই। দু'জন আবৃত্তি করে শোনাল লম্বা লম্বা কবিতা। রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, লালন ফকিরের গান গাইল কয়েক জন। রেহানাও বেশ ভাল গান জানে। প্রথমে সে কিছুতেই গাইতে রাজি হয়নি, মিন্টুর পেড়াপিড়িতেই তাকে হারমোনিয়াম ধরতে হল। মেয়ের গুণাবলীর জন্য খুব গর্বিত মিন্টু। সে নিজেও কবিতা পাঠ করল একেবারে শেষে।

অবনী গান জানে না। কবিতা আবৃত্তি করেনি কখনও। তবু তাকেও কিছু বলতে হল। প্রথম বাংলাদেশ দেখার অভিজ্ঞতা। পূর্বপুরুষদের জন্মস্থান প্রসঙ্গে তার গলায় তেমন আবেগ ফুটল না।

এর মধ্যে সে অন্তত তিনবার মিন্টু ও রেহানাকে জিজ্ঞেস করেছে, তার ফ্লাইট সত্যিই ডিলেইড কি না।

আসর ভাঙার পর সে রেহানাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি বাফেলোতে কবে জয়েন করছেন?

রেহানা বলল, সামনের মাসের দশ তারিখে।

অবনী বলল, বাফেলোর কাছেই নায়েগ্রা জলপ্রপাত না? একবার নিশ্চয়ই দেখতে যাব। তখন খোঁজ করব আপনার।

রেহানা বলল, অবশ্যই আসবেন। আমিও বোস্টনে যাব। খুব সুন্দর শহর শুনেছি।

পাশ থেকে মিন্টু বলল, একটু মুশকিল কি হয়েছে জানেন? রেহানার হাজব্যান্ড আনোয়ার থাকে ক্যালিফোর্নিয়ায়। একেবারে অন্য প্রান্তে। দু'জনে থাকবে অত দূরে দূরে, যাওয়া-আসার খরচও তো অনেক। যদি মেয়েটা ওয়েস্ট কোস্টের কোনও ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন পায়, অনেক সুবিধে হয়।

রেহানা বলল, আব্বু, আমি যেখানে অ্যাডমিশান পেয়েছি, আমার সাবজেক্টের জন্য সেই ইউনিভার্সিটির খুব নাম আছে। ওটাই আমার পক্ষে ভাল।

সিরাজুল বললেন, অবনী, তুমি মেয়েটার একটু খোঁজখবর নিও। তোমার ঠিকানা, ফোন নাম্বার...।

অবনী বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমি লিখে দিয়ে যাচ্ছি।

.

০৫.

অক্টোবরের কুড়ি তারিখ, এর মধ্যেই বরফ পড়তে শুরু করেছে।

বরফ পড়াটা কথার কথা, আসলে তুষারপাত। পেঁজা তুলোর মতো কিংবা পাখির সাদা পালকের মতো দুলতে দুলতে নামে, একটু পরেই গাছপালাগুলো সব সাদা হয়ে যায়।

প্রথম কয়েক বার এ দৃশ্য বিমোহিত করে রাখে। কাচের জানলায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখতে ইচ্ছে হয়। আস্তে আস্তে বদলে যায় পৃথিবীর রূপ। সব দিকে শুভ্রতা।

কয়েকদিন পর এ দৃশ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর ওই মুগ্ধতাবোধ থাকে না। তখন নানা অসুবিধের কথা মনে পড়ে। তুষারপাত হলেই তো আর ঘরে বসে থাকলে চলে না, কাজে বেরুতে হয়, দোকানে যেতে হয়। তার জন্য পরতে হয় একগাদা পোশাক, ঠাণ্ডা ছাড়াও যখন তখন পা-পিছলে পড়ার সম্ভাবনা।

অবনীর গাড়ি নেই। গাড়ি চালানো সে শিখে এসেছে কলকাতা থেকেই, ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্সও নিয়ে এসেছে, কিন্তু এখনও গাড়ি কেনার সামর্থ্য হয়নি। একটা সেকেন্ডহ্যান্ড সাইকেল কিনেছে, অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছে জ্যাকসন স্ট্রিটে, কাছেই একটা টিউব স্টেশন।

এখন তুষারপাত হলেই অবনীর মনখারাপ লাগে। নিঃসঙ্গতা বোধটা তাকে চেপে ধরে। বিশেষত শেষ বিকেলের দিকে।

ওভারকোটের কলার তুলে দিয়েছে, দু'হাতে গ্লাভস, পাড়ায় গ্রসারি স্টোর থেকে কিছু মাছ-মাংস আর সবজি কিনে, খাকি রঙের ঠোঙাটা বুকে চেপে বাড়ি ফিরছে অবনী। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। মনে হয় যেন পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

এই রকম সময় মনে হয়, ধুৎ, কেন বিদেশে এই রকম ভাবে পড়ে থাকা! একটা আমেরিকান ডিগ্রি কিংবা কিছু ডলার জমিয়ে কী এমন হাতি-ঘোড়া পাওয়া যাবে? আজকাল বিদেশি ডিগ্রির তেমন কোনও কদর নেই। দেশে অবনীর অবস্থা বেশ সচ্ছলই ছিল, আরও বেশি উপার্জনের লোভেও সে আসেনি। কিন্তু বিদেশে না আসাটা যেন দারুণ অযোগ্যতা। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ ভাল রেজাল্ট করেও বিদেশে না গেলে অন্যরা বলে, কী রে, তুই চান্স পেলি না? তাই, যেন যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্যই আসা।

সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠে দু'পা ঠুকে বরফ ঝাড়ল অবনী। মাথা থেকে টুপিটা খুলে পকেটে রাখল। প্রধান দরজাটা বন্ধ থাকে সব সময়, প্রত্যেক ভাড়াটে কোড নাম্বার টিপে সেই দরজা খোলে।

বাড়িটা চার তলা। অবনীর অ্যাপার্টমেন্ট সব চেয়ে ওপরতলায়। অ্যাটিকের ঘর খানিকটা সস্তা হয়। ব্যাচেলরের পক্ষে দেড়খানা ঘরই যথেষ্ট।

চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল অবনী। ঘড়িতে এখন বিকেল শেষ হয়নি, এর মধ্যে আকাশ অন্ধকার। এ ঘরের এক দিকে বিরাট জানলা, অনেকখানি আকাশ দেখা যায় অন্য সময়।

রোজ রোজ শুধু নিজের জন্য রান্না করতে কী যে একঘেয়ে লাগে! একা একা বসে খাওয়া।

কলকাতায় অবনীর ফ্ল্যাটটা বেশ বড়। এক বিধবা মামাতো দিদি সেখানে আছেন অনেক দিন। তাঁর দুই ছেলে। ওরাই সংসার চালায়। হাট-বাজার করার কথা অবনীকে কখনও ভাবতে হয়নি। সে কখনও এককাপ চা-ও বানায়নি নিজে। এখানে সব কিছুই করতে হয়। বাসন মাজার সময় এক-এক দিন তার ইচ্ছে হয় সব কিছু ছুঁড়ে ভেঙে ফেলতে।

ঘরে ঢুকেই প্রথমে টিভি চালিয়ে দেয় অবনী। বেশির ভাগ প্রোগামই দেখতে তার ভাল লাগে না, তবু টিভি চলতে থাকলে মনে হয়, ঘরের মধ্যে অন্য কেউ কথা বলছে, তাতে নির্জনতা খানিকটা কাটে।

প্রায় মাস দু'এক কেটে গেলে বোস্টনে। এখানে অনেক বাংলাদেশি এবং ভারতীয় আছে। কয়েক জনের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছে। তবে ঘনিষ্ঠতা হয়নি কারুর সঙ্গে।

ছাত্রদের তুলনায় অবনী বয়সে খানিকটা বড়। পড়াশুনো শেষ করেই অবনী আসার চেষ্টা করেনি, কয়েক বছর অধ্যাপনা করেছে। ছাত্র ছাড়া, আর যারা অনেক দিন ধরে আছে, তারা সবাই বিবাহিত, সস্ত্রীক সংসার পেতেছে।

অবনী এদের মাঝামাঝি। সে বিয়ে করার কথা এত দিন চিন্তা করেনি। মা আর মামারা মাঝে মাঝে চাপ দিয়েছে বটে, কিন্তু খবরের কাগজ দেখে একটা অচেনা মেয়েকে বিয়ে করা যায় নাকি?

যাকে প্রেম বলে, সে-অভিজ্ঞতা অবনীর কখনও হয়নি। কিছু কিছু মেয়েকে চেনে অবশ্যই। আলগা ভাবে বন্ধুত্ব হয়েছে, তার বেশি কিছু নয়। এম এসসি পড়ার সময় জয়া নামের একটি মেয়ে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অবনী তখন পড়াশুনো নিয়ে এমনই ব্যস্ত যে, জয়া সম্পর্কে বেশি মাথা ঘামাতে পারেনি। জয়া একটা চিঠিও লিখেছিল, উত্তর দেওয়া উচিত ভেবে ভেবেও লেখা হয়নি শেষ পর্যন্ত। অবনীর পরীক্ষা যখন শেষ হল, তার মধ্যে বিয়ে করে ফেলেছে জয়া। পরে একবার জয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে কথাই বলেনি। জয়ার তো রাগ হতেই পারে, অবনীরই দোষ।

বাফেলো থেকে রেহানা ফোন করেছিল এক দিন।

সে ভালভাবে পৌঁছে গেছে, আপাতত পেয়িং গেস্ট হয়ে আছে এক বাড়িতে, আগামী মাসে অ্যাপার্টমেন্ট পেয়ে যাবে।

রেহানার ফোন নাম্বার লেখা কাগজটা সাঁটা আছে ফ্রিজের গায়ে, কিন্তু অবনী এক দিনও ফোন করেনি। রেহানা নিজে থেকেই প্রথম ফোনটা করেছে, এরপর একবার অন্তত তাকে ফোন করা উচিত, অন্তত নিছক ভদ্রতাবশতই করা উচিত ছিল।

কেন রেহানাকে ফোন করার ইচ্ছে হয়নি অবনীর? সে নিজেকেই বিশ্লেষণ করতে চায়।

বাংলাদেশে সিরাজুল সাহেবের বাড়ির আতিথেয়তায় সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছে। এত আন্তরিক ব্যবহার, এত সহজে আপন করে নেওয়া!

ঢাকার হোটেলে পড়ে রইল মালপত্র, অবনীকে রাত কাটাতে হল নারায়ণগঞ্জে। মিন্টু এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর বাংলাদেশ বিমানে তার বন্ধুকে ফোন করে ফ্লাইটের খবর জেনে অবনীকে আশ্বস্ত করেছে।

সিরাজুল সাহেব বলেছিলেন, নিজের বাপ-ঠাকুর্দার বাড়িতে অন্তত একটা রাত্রি বাস করে যাও!

অবনীকে আপ্যায়ন করার জন্য ওঁদের তো কোনও স্বার্থ ছিল না। একেই বলে আন্তরিকতা।

রেহানাকে তার বেশ ভাল লেগেছিল। যদিও মাত্র দু'দিনের পরিচয়। কারুর কারুর সঙ্গে অনেক বার দেখা হলেও আড়ষ্টতা কাটে না, আবার কারুর কারুর সঙ্গে অল্প সময়েই ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়। রেহানার স্বভাবটাই ঝর্নার জলের মতো।

কিন্তু রেহানা বিবাহিত, এটা জানার পরই অবনী সহজ ভাবটা হারিয়ে ফেলল কেন? আর সে রেহানার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা চালিয়ে যেতে পারেনি!

তাহলে কি সে রেহানার প্রেমে পড়েছিল, কিংবা তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল? মোটেই না। সে-রকম চিন্তা ঘুণাক্ষরেও তার মনে আসেনি। এমনিই সম্পর্কটা এগোচ্ছিল বন্ধুত্বের দিকে।

একটি তরুণী মেয়ে বিবাহিত জানলেই সম্পর্কের এত তফাৎ হয়ে যায়?

প্রথম পরিচয়ের সময় কেউ তো আর জানতে চায় না, তুমি বিবাহিত না অবিবাহিত? অবনী সম্পর্কেও ওরা কিছু জানতে চায়নি।

অবনী যেন ধরেই নিয়েছিল, রেহানা যেহেতু এখনও ছাত্রী, তাই তার বিয়ে হয়নি। ছাত্রবয়সে কারুর বিয়ে হয় না? শুধু মেয়ের কেন, ছেলেদেরও হয়। অবনীর বন্ধু মৃণালই তো মাত্র বাইশ বছর বয়েসে তার এক সহপাঠিনীকে বিয়ে করে ফেলেছে।

রেহানার স্বামী এ-দেশে থাকে, এটা শোনার পরই কেন চুপসে গিয়েছিল অবনী?

রেহানার স্বামী আনোয়ার খুব গুণী পুরুষ। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, চাকরি করে আই বি এম-এর মতো বড় কোম্পানিতে। নিজের সাবজেক্টে তার একটা বইও ছাপা হয়েছে এখান থেকে। সে আবার কবিতাও লেখে। বাংলাদেশে সবাই কি কবিতা লেখে?

আনোয়ারের ছবিও দেখেছে অবনী, রীতিমতো সুপুরুষ। রেহানার সঙ্গে সুন্দর মানিয়েছে, বলতেই হবে।

পূর্বাণী হোটেলের লবিতে অবনী যখন অপেক্ষা করছিল, ভেবেছিল মিন্টু তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, তার বদলে রেহানা হঠাৎ এসে হাজির হল। তার সেই ঝলমলে রূপ দেখে অবনীর বুকের মধ্যে ধক করে উঠেছিল। এখনও রেহানার মুখটা মনে করলেই তার বুকের মধ্যে একটু ব্যথা ব্যথা করে! একেই কি প্রেম বলে? যদি হয়ও, এই প্রেম নিজের মধ্যে গোপন রাখাই ভাল।

টেলিফোনটার দিকে মাঝে মাঝে চোখ পড়ে অবনীর। মাকে সপ্তাহে একবার সে ফোন করে। মা এখন কলকাতার ফ্ল্যাটে এসে আছেন। অবনীর আত্মীয় স্বজনের সংখ্যা বড় কম। সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে বেশ কয়েক জন এখন ইউরোপ-আমেরিকায়। তবে বোস্টনে কেউ থাকে না। কাছাকাছির মধ্যে অতীন আছে ওয়াশিংটন ডিসি-তে। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে কথা হয়।

রেহানাকে ফোন করে কী কথা বলবে, তা অবনী ভেবেই পায় না।

এই তুষারঝরা সন্ধেবেলা কারুর সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করে। অতীন কালই ফোন করেছিল, আজ কি তাকে ফোন করা যায়?

ফোনটা ঝন ঝন করে বেজে উঠল।

কণ্ঠস্বর শুনে অবনী কেঁপে উঠল। অবিশ্বাস্য। যার কথা এতক্ষণ ভাবছিল, সে-ই ফোন করেছে। এ কি ফোন না টেলিপ্যাথি?

রেহানা বলল, কেমন আছেন? আপনি এর মধ্যে ফোন-টোন করলেন না তো?

অবনী আমতা আমতা করে বলল, এই তো আজকেই ভেবেছিলাম, আসলে কয়েক দিন খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

রেহানা কৌতুকের সুরে বলল, আজকেই ভেবেছিলেন? এটা সত্যি কথা?

হ্যাঁ সত্যি।

আচ্ছা, আপনাকে বেনিফিট অফ ডাউট দেয়া গেল। আজ এখানে কী দারুণ বরফ পড়ছে। সারা দিন। কী মজা! কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে! আমার হাজব্যান্ড দুপুরে ফোন করেছিল। ও ক্যালিফোর্নিয়ায় যেখানে থাকে, সেখানে সারা বছরেই একবারও বরফ পড়ে না। ওকে বললাম, তুমি এসে দেখে যাও! নায়েগ্রা ফলস অনেকটা জমে গেছে। সে বলল, পাখি হলে ডানা মেলে উড়ে যেতাম! আপনাদের ওখানে...।

এখানেও সারা দিন বরফ পড়ছে। কিন্তু আমার মোটেই সুন্দর লাগছে না।

কেন?

ঘরে বসে ও-সব দেখতে ভাল লাগে। আমাকে কাজে যেতে হয়েছিল, বাজার করতে হল, তখন বিরক্তিকর মনে হয়!

আপনি খুব বেরসিক তো। অমিও বেরিয়েছিলাম। কাজ ছিল না, ইচ্ছে করে। চোখ একেবারে জুড়িয়ে গেল। আপনি কি রেস্টুরেন্টে খেতে যান না নিজে রান্না করেন?

রোজ রেস্টুরেন্টে খাব। অত পয়সা কোথায়? নিজেই রান্না করি।

রাঁধতে জানেন?

ঠেলায় পড়ে শিখে নিয়েছি।

কী রাঁধেন, খিচুড়ি?

সেই খিচুড়ির কথা ভুলতে পারছেন না? খুব খারাপ খাইয়েছি, স্বীকার করছি। মাপ চাইছি।

শুধু মাপ চাইলে চলবে না। পরে এক দিন ভাল করে খাওয়াতে হবে।

নিশ্চয়ই।

আপনি নায়েগ্রা ফলস দেখতে আসবেন না? দেখেননি তো আগে। এখানে সবাই বলছে, শীতকালে নায়েগ্রার একেবারে অন্য রূপ। এটাই বেশি ভাল।

সময় করে যেতে হবে। শীত তো এখন অনেক দিন চলবে।

তাড়াতাড়ি আসুন। কয়েকটা সহজ রান্না শিখিয়ে দেব! এর মধ্যে কী কী শিখেছেন? ভাত?

বাঃ, ভাত ছাড়া রোজ রোজ রুটি খাওয়া যায় নাকি?

ফ্যান গালতে জানেন?

ইন্সট্যান্ট রাইস পাওয়া যায়, ফ্যান গালতে হয় না। ডাল রাঁধতেও পারি। আর মাছ ভাজা, ডাবল ডিমের ওমলেট।

ওমলেট? কলকাতায় ওমলেট যেখানেই খেয়েছি, যাচ্ছেতাই! আপনারা ওমলেট বানাতে জানেন না। শুধু কয়েক টুকরো পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচ দিলেই বুঝি ওমলেট হয়? ওমলেট কী করে সুন্দর, নরম হয় বলুন তো? কী দিতে হয়?

আমার তো নরমই হয়!

হতেই পারে না। ডিম ভাঙার পর তাতে এক চামচ দুধ দিতে হয়। তারপর ভাল করে ফ্যাটাতে হয়। দেখবেন কী-রকম ফুলে উঠবে।

আচ্ছা, পরীক্ষা কবে দেখব।

এইসব অতি সাধারণ কথাবার্তাতেই কেটে গেল আধ ঘণ্টা।

ফোনটা রাখার পব অবনী ভাবল, সে রেহানার সঙ্গে কী কথা বলবে বুঝতে পারছিল না, কিন্তু এ-রকম সাধারণ কথা দিয়েই তো মানুষের সঙ্গে আলাপ চালানো যায়। কোনও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নেই।

রেহানার কথার মধ্যে খানিকটা কৌতুক আর খানিকটা বকুনির সুর থাকে। শুনতে বেশ লাগে। ওর কথামতো খানিকটা দুধ মিশিয়ে একটা ওমলেট বানিয়ে ফেলল। সত্যিই তো অন্য রকম।

একটা টেলিফোন পেয়েই নিঃসঙ্গতা বোধই কেটে গেল অনেকটা। অবনী কমপিউটারে কাজে বসে গেল এর পরে।

পরের সপ্তাহে স্থানীয় বাঙালিদের একটি অনুষ্ঠানে টিকিট কাটতে হল অবনীকে। পশ্চিম বাংলার বাঙালি আর বাংলাদেশিদের আলাদা গোষ্ঠী, তা অবনী লক্ষ্য করেছে। এ-রকম দু'একটা অনুষ্ঠানে তারা মিলিত হয়। বাংলাদেশিদের সংখ্যাই বেশি, বাংলা অনুষ্ঠানে তারাই বেশি উৎসাহ দেখায়। টিকিট বিক্রির টাকা পাঠানো হবে বাংলাদেশের বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য।

এ-রকম অনুষ্ঠানে যেতেই হয়। গান-বাজনা-নাচ সবই আছে, কোনওটাই তেমন আহামরি কিছু নয়। এখানে হলভাড়া অনেক, তাই অনুষ্ঠান হচ্ছে একটা বাড়ির বেসমেন্টে, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন শ্রোতা।

টিকিটের সঙ্গে খাদ্য-পানীয়ও যুক্ত। আজ আর অবনীকে রান্না করতে হবে না। অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও হল।

এদের মধ্যে একটি দম্পতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটা গেলাসে বিয়ার নিয়ে অবনী দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল, সাদেক নামে একটি ছেলে প্রথমে নিজে এসে যেচে আলাপ করল তার সঙ্গে। সাদেক একটি দোকানের মালিক, সে বাংলাদেশ থেকে অনেক রকম মাছ আনায়। মাছ-প্রিয় বাঙালিরা সবাই তার দোকান চেনে।

একটু পরে সে অবনীকে জিজ্ঞেস করল, আপনার সঙ্গে জহির ভাইয়ের আলাপ নেই? আসেন আসেন, পরিচয় করিয়ে দিই। জহির ভাইয়ের বাসায় আমাদের প্রায়ই আড্ডা বসে।

জহির নামের লোকটি মনে হয় ছ'ফুটের বেশি লম্বা। মাথার চুল কাঁচা-পাকা, তবে চল্লিশের বেশি বয়স নয়। দামি সুট পরা, এমনই ফর্সা রঙ যে, দাড়ি কামাবার জায়গায় গালে একটা নীলচে ছোপ পড়েছে। প্রথম দর্শনে অবনীর মনে হল, ভদ্রলোক বাঙালি নয়, পাকিস্তানি হতে পারে।

কিন্তু জহিরের মুখের ভাষা বাংলা তো বটেই, সম্ভাষণে সে সেলাম আলেকুম-এর বদলে বলল, নমস্কার। তারপর জিজ্ঞেস করল, আপনি পশ্চিম বাংলা থেকে এসেছেন? কোথায় বাড়ি, কলকাতায়?

অবনী বলল, কলকাতায় থাকি বটে, আসল বাড়ি বর্ধমানে।

জহির সহাস্যে হাত বাড়িয়ে বলল, আসুন, আসুন, তাহলে কোলাকুলি করি। আমরা দেশোয়ালি। আমার বাড়িও বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জে।

জহিরের স্ত্রী একটু দূরে অন্যদের সঙ্গে গল্প করছিল, তাকে ডেকে আনা হল।

জহির বলল, আমার স্ত্রী কিন্তু বাংলাদেশের মেয়ে। টাঙ্গাইলের। সীতা, এই ভদ্রলোক আমাদের বর্ধমান জেলার লোক। এক দিন বাড়িতে ডাকো।

মহিলাটি নমস্কার করে বলল, নিশ্চয়ই, আসুন এক দিন। আপনাকে আগে দেখিনি। নতুন এসেছেন?

সাদেক বলল, আমি পর্যন্ত চিনি না, এমন বাংগালি আছে? দাদার কাছে শুনলাম, জ্যাকসন স্ট্রিটে একলা একলা থাকেন।

বাঙালি মুসলমান মেয়েদের বীথি, কাজল, নীলা এই ধরনের ডাকনাম থাকে। কিন্তু সীতা? ঠাকুর-দেবতার নাম বাদ দেওয়াই ওদের পক্ষে স্বাভাবিক। অবনী সীতার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইল।

সাদেক বলল, সীতা ভাবির হাতের রান্না একবার খেলে জীবনে ভুলবেন না। সত্যি কথা বলতে কি, হিন্দুরাই মাছটা ভাল রান্না করতে জানে। আমরা আবার মাংসটা ভাল জানি।

সীতা বলল, সে কী রে, আমি মাংস ভাল রাঁধি না? গত শনিবার যে বললি- ।

জহির বলল, এখানে বাঙালিরা দেখা হলেই বড় বেশি খাওয়া-দাওয়ার কথা বলে। আপনার ভালগার মনে হয় না?

অবনী চুপ করে রইল। কথাটা সত্যি। সে-ও লক্ষ্য করেছে।

জহির আবার বলল, কিছু দিন পর আপনারও অভ্যেস হয়ে যাবে। আপনিও সাদেকের দোকানে ইলিশ মাছ দেখলে বন্ধু-বান্ধবদের ফোন করে জানাবেন। বাঙালির কালচারে শিল্প-সাহিত্য না মাছ ভাত, কোনটার টান বেশি, তা বলা শক্ত! দিনের পর দিন স্যান্ডুইচ খেতে হলে বাঙালির রস-কষ শুকিয়ে যায়।

সীতা বলল, আমার স্বামী খুব সাহেব। সপ্তাহে এক দিন মোটে ভাত খায়।

জহির বলল, শুধু শনিবার রাত্রে। শনিবার আড্ডাও হয়। এই শনিবার আপনি চলে আসুন! যারা নতুন আসে, তাদের কিছু কিছু অসুবিধে ফেস করতে হয়। সে-ব্যাপারে আমি টিপস দিতে পারি।

জহিররা থাকে সমারভিল-এ স্প্রিংফিল্ড স্ট্রিটে। রাস্তা চিনে যাওয়া অবনীর পক্ষে শক্ত। ঠিক হল, বিপুল নামে এক জন ছাত্র তাকে তুলে নিয়ে যাবে।

ছাত্র হলেও বিপুলের অবস্থা বেশ সচ্ছল মনে হল। দেশ থেকে স্ত্রীকে আনিয়েছে, তার গাড়িটিও বেশ দামি। অনবরত সিগারেট খায়। তার স্ত্রী মৃদুলার ছোট্টখাট্টো চেহারা, কিন্তু দু'একটা কথা শুনলেই বোঝা যায়, বেশি বুদ্ধিমতী।

গাড়িতে উঠে সামান্য মামুলি আলাপের পরই বিপুল জিজ্ঞেস করল, দাদা, আপনার পদবি তো চৌধুরী। আপনি কি ব্রাহ্মণ? চৌধুরীরা তো অনেক কিছুই হয়।

অবনী কিছুটা অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ, ব্রাহ্মণই বটে। চৌধুরী তো খেতাব। আমাদের অরিজিনাল টাইটেল ছিল নাকি চক্রবর্তী। হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

বিপুল বলল, আমরা মেদিনীপুরের লোক। আমার টাইটেল দাস মহাপাত্র। হাফ ওড়িয়া হাফ বাঙালি বলতে পারেন। মৃদুলারা ব্রাহ্মণ। আমাদের বিয়ের সময় খুব ঝামেলা হয়েছিল। ব্রাহ্মণরা বড় জ্বালায়!

অবনী বলল, আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি ব্রাহ্মণ কি না তাতে কী আসে যায়? ব্রাহ্মণরা তোমার বিয়ের সময় জ্বালিয়েছিল বলে কি তুমি আমাকে গাড়িতে নেবে না?

বিপুল বলল, তা বলছি না। হঠাৎ কথাটা মনে এল। ব্রাহ্মণরা জাত-পাত নিয়ে এখনও এত মাথা ঘামায়, আপনাদের মতো শিক্ষিত লোকরা এটা বদলাতে পারেন না?

অবনী বলল, একটু একটু বদলেছে। অনেকে এখন সব মানে না।

বিপুল বলল, গোটা হিন্দু ধর্মের মধ্যেই এত জাত, এত ভেদাভেদ, এতে কত যে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, সেটা কেন আমরা বুঝি না! কেন সব হিন্দু সমান হবে না?

অবনী বলল, বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দর মতো বড় মাপের কোনও মানুষ তো আমাদের মধ্যে এখন নেই। ওই রকম কেউই বদলাতে পারেন। তোমার-আমার কথা কে শুনবে? তবে কিছু না-কিছু জাতিভেদ বা আলাদা সম্প্রদায় তো সব ধর্মেই আছে। মুসলমানদের

মধ্যে শিয়া-সুন্নি নেই? তারপর কাদিয়ানি, আরও কী সব যেন আছে। তাদের মধ্যে মারামারিও হয়। আয়ারল্যান্ডে ক্যাথলিক প্রেটেস্টান্টদের মধ্যে মারামারি হয় না? এই আমেরিকাতেও অন্য ক্রিশ্চানদের চেয়ে অ্যাংলো স্যাক্সন প্রোটেস্টান্টদের দাপটই বেশি।

পেছনের সিট থেকে মৃদুলা বলল, আমাদের বিয়েতে আর এমন কী ঝামেলা হয়েছে! আপনি জহির সাহেব আর সীতা বউদির রোমান্সের কথা শুনেছেন? আমেরিকার মতো জায়গাতেও তা নিয়ে তুলকালাম হয়েছিল।

অবনী বলল, আমি কিছু শুনিনি, এই তো সদ্য আলাপ হল।

মৃদুলা বলল, সীতাবউদিরা বাংলাদেশের হিন্দু। তার ওপর ব্রাহ্মণ। অসম্ভব গোঁড়া। সীতাবউদির মুখেই শুনেছি, ঢাকায় পড়াশুনোর সময় একটি কায়স্থ ছেলে ওঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, বাড়ির লোক রাজি হয়নি। তারপর তো উনি চলে এলেন ব্লুমিংটন, ইন্ডিয়ানা-তে। সেখানে ওঁর এক মামা থাকেন, তার বাড়িতে থেকেই সীতাবউদি পড়াশুনো করতেন। জহির সাহেবও পড়াশুনোতে ভাল, ইঞ্জিনিয়ার, এখন অবশ্য এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা করেন। দুজনের আলাপ, তারপর প্রেম। বিয়ের কথা উঠতেই দুই পরিবারের ঘোর আপত্তি। জহির সাহেবের বাবা-মা, ভাই সবাই এ-দেশে।

জহিরের বাড়ি থেকেও আপত্তি করল? সাধারণত ওরা এত কিছু মানে না।

ভুল ধারণা। ওরা নাকি বনেদি বংশ। ওদের বাড়িতে শিয়া সম্প্রদায়ের কোনও মেয়েও বউ হয়ে আসতে পারে না। হিন্দু মেয়ে তো দূরের কথা। জহির সাহেবের মা কান্নাকাটি করে আত্মহত্যার ভয় দেখিয়েছিলেন। আর সীতাবউদির মামা তো আরও কেলেঙ্কারি করেছিলেন, তিনি ভাগ্নিকে ঘরে আটকে রেখেছিলেন তালাচাবি দিয়ে।

সীতা তখন অ্যাডাল্ট নয়?

অবশ্যই অ্যাডাল্ট, ছাব্বিশ বছর বয়স।

তাহলে, এ-ভাবে আটকে রাখা সম্পূর্ণ বে-আইনি। পুলিশ জানতে পারলে –।

জহির সাহেব তারপর কী করলেন, শুনুন না। নিজের বাড়িতে বললেন, ঠিক আছে, ওই হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করব না। আর সীতাবউদির মামার বিরুদ্ধে পুলিশেও খবর দিলেন না। যেন খুব উদাসীন হয়ে গেলেন। আসলে তক্কে তক্কে থাকতেন। সীতাবউদির মামা কখন বাড়িতে থাকেন না, সে খবর নিতেন। এক দিন সেই রকম সময়ে ও-বাড়ির জানলা ভেঙে সীতাবউদিকে বার করে আনলেন। তারপর দুজনে মিলে চম্পট।

এ যে রীতিমতো সীতা উদ্ধার কাহিনি।

হ্যাঁ, কিন্তু এরপর দুজনের আর পাত্তাই পাওয়া গেল না। দু'পক্ষ থেকেই প্রচুর খোঁজাখুঁজি, তারপর কান্নাকাটি। সাড়ে চার মাস ওঁরা একেবারে উধাও! প্রকাশ্যে উদয় হলেন এই বোস্টন শহরে, এর মধ্যে রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেছে। তত দিনে দু'পক্ষই ঠাণ্ডা!

বিপুল বলল, পুরো ঠাণ্ডা নয়। জহির সাহেবের বাবা এখনও ছেলের সঙ্গে কথা বলেন না।

মৃদুলা বলল, কথা বলেন না, কিন্তু ছেলের টাকা তো নিতে হয়।

বিপুল বলল, সাত-আট বছর হয়ে গেল, ওদের দুজনের প্রেমকাহিনি। এখনও অনেকে বলাবলি করে। এমন একটা চমৎকার কাপল খুব কম দেখা যায়।

জহির-সীতারা ফ্ল্যাটে থাকেন না, নিজস্ব বাড়ি। সামনে লন, পেছনে সুইমিং পুল। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা প্রায় কুড়ি-বাইশ জন। প্রতি শনিবারই নাকি এ-রকম হয়। প্রচুর খাদ্য-পানীয়র ব্যবস্থা।

অবনীর একটা ব্যাপার বেশ পছন্দ হল।

সিরাজুল সাহেবরা বর্ধমানের বাড়িতে আসার আগে আর কোনও বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি। পাকিস্তানি আমলে সে খুব ছোট ছিল, বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার

পরেও ও-দিকে কখনও সে যেতে আগ্রহী হয়নি। কাগজে মাঝে মাঝে কিছু খবর পড়েছে, তাহলেও ও-দিককার বৃহত্তর বাঙালি জাতি সম্পর্কে তার বিশেষ কিছু ধারণা ছিল না। কাগজে তো ঝড়, বন্যা বা মারামারির খবরই বেশি থাকে। বাংলাদেশ থেকে যারা কলকাতায় আসে, তারাও তো বাজার-টাজার করে ফিরে যায়, কটা পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা হয় তাদের?

কিন্তু এখানে এসে সে দেখছে, আলাদা আলাদা গোষ্ঠী হলেও, দুদিকের বাঙালিদের মধ্যে পারিবারিক যোগাযোগও আছে যথেষ্ট। এ বাড়িতে এত জন অতিথির মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের কোনও প্রশ্নই নেই যেন। শুধু নাম শুনে বোঝা যায়, আর তফাৎ নেই কিছু।

জহিরসীতার মতো মিশ্র বিবাহও দুর্লভ নয় মোটেই।

অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বার বার অন্য মনস্ক হয়ে যেতে লাগল অবনী।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় বারোটা হয়ে গেল।

তার অ্যাপার্টমেন্টটা আজ এত ঠাণ্ডা কেন? সেন্ট্রাল হিটিং চালায়নি? বিছানাটা ঠাণ্ডায় স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। সে আর একটা রুম হিটার চালিয়ে দিল।

হঠাৎ খুব ইচ্ছে করল রেহানাকে ফোন করতে। এত রাতে কি ফোন করা উচিত? উইক এন্ডে সকলেরই বেশি রাত হয়। তাহলেও...।

ফোনের আনসারিং মেশিনে লাল আলো টিপ টিপ করছে। অর্থাৎ জমে আছে বার্তা। অবনী বোতাম টিপল।

প্রথম বার্তাটা তার বন্ধু অতীনের। সে আগামী মাসে দেশে যাচ্ছে। দ্বিতীয়টি এক অধ্যাপকের, তিনিও ভারতে যাচ্ছেন, ব্যাঙ্গালোরে বক্তৃতার আমন্ত্রণ পেয়েছেন, ভারত সম্পর্কে দুই-একটা বই পড়তে চান। তৃতীয় বার্তাটা...।

আবার অবনী কেঁপে উঠল। রেহানার কণ্ঠস্বর।

এই নিয়ে রেহানা তৃতীয় বার তাকে ফোন করল। অবনী নিজে থেকে করেনি একবারও। এটা কি চূড়ান্ত অভদ্রতা নয়?

মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে, কিন্তু প্রথম কী কথা দিয়ে শুরু করবে, সেটাই ঠিক করতে পারেনি।

রেহানা ফোন নাম্বার দিয়ে রেখেছে মানে অবনীকে ফোন করতে বলা হচ্ছে। জরুরি কোনও ব্যাপার আছে? অবনীর সঙ্গে রেহানার এমন কী জরুরি কথা থাকতে পারে?

এখন, না কাল সকালে?

রেহানা অন্যের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকে, এত রাত্রে সেখানে ফোন করা চলে না। তবু অবনী কৌতূহল দমন করতে পারছে না।

দু'বার বাজতেই রেহানার গলা পাওয়া গেল। আমি অবনী। তুমি ফোন করেছিলে?

করেছিলাম তো। মেসেজ পাননি?

হ্যাঁ, সেটা শুনেই... এত রাত্রে ফোন করা আমার উচিত হয়নি।

রাত্রে কেন, দিনেও তো আপনি ফোন করেন না।

দিনেরবেলা ব্যস্ত থাকি, তুমি নিজে এই ক'বার ফোন করলে... ও আই অ্যাম সরি, তুমি বলে ফেলেছি, আজ খানিকটা হুইস্কি খেয়ে ফেলেছি তো।

শুনুন, আমি ফোন করেছিলাম আমার নতুন নাম্বারটা জানাবার জন্য। আজই আমি নিজের অ্যাপার্টমেন্টে এসেছি, এখানে ফোন আছে।

তাই নাকি? আজই নতুন অ্যাপার্টমেন্টে... কীরকম, কারুর সঙ্গে শেয়ার করতে হবে?

না। আর একটা কথাও জানাবার ছিল। মুসাফির, মানে সিরাজুল চৌধুরী আগামী মাসে চেকআপ করাবার জন্য এ দেশে আসছেন। উনি আপনাকে জানাতে বললেন। উনি যখনই ফোন করেন, আপনার কথা জিজ্ঞেস করেন।

এ-দেশে আসছেন? খবর পেলে নিশ্চয়ই আমি দেখা করব।

খবর পাবেন। ঠিক আছে, এবার রাখি? খোদা হাফেজ।

হঠাৎ-ই যেন রেখে দিল রেহানা। আজ তার কথার মধ্যে কৌতুক ছিল না, কেমন যেন গম্ভীর গম্ভীর। ওকে তুমি বলে ফেলাটা পছন্দ করেনি? বলল না তো, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমিই বলবেন।

ভুল হয়েছে, তুমি বলাটা ভুল হয়েছে। রেহানা বয়সে এমন কিছু ছোট নয়!

নতুন অ্যাপার্টমেন্টে, নতুন ফোন নাম্বার সবাইকে জানাতে ইচ্ছে করে। রেহানা নিশ্চয়ই অনেককেই জানিয়েছে, তাদের মধ্যে অবনী এক জন। জরুরি কোনও খবরও ছিল না।

আর একবার ফোন করে তুমি বলার জন্য মাপ চাইবে? অবনী টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল।

.

০৬.

একটা অ্যালার্ম ঘড়ি কিনব কিনব করেও কেনা হয়নি। এক-এক দিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে যায়।

বড় কাচের জানলাটার পর্দা খোলাই রাখে অবনী, যাতে সকালের রোদ এসে চোখে পড়ে কিন্তু হায়, এ-দেশে শীতকালে সূর্যই যে দুর্লভ। প্রায়ই সারা দিন আকাশ থমথমে থাকে।

হঠাৎ যে-দিন ঝকঝকে রোদ ওঠে, সে-দিন দলে দলে মানুষজন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। গায়ে রোদ মাখাটা যেন উৎসবের মতো।

আশ্চর্য ব্যাপার, যখন বরফ পড়ে, তখন খুব বেশি শীত থাকে না। রোদ্দুর উঠলেই শীত লাগে বেশি।

আজ ঘুম ভেঙেছে, তবু বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না।

জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র রঙের আকাশ। একটু দূরে পাশাপাশি দুটো উইপিং উইলো গাছ। শীতকালে একেবারেই পাখি দেখা যায় না। বাতাসে কী যেন ভাসছে।

উইক ডেজ আর উইক এন্ডে অনেক তফাৎ। উইক ডেজ মানেই দায়িত্ব আর ব্যস্ততা। সব কিছুই নিয়মে বাঁধা। ঘুম থেকে উঠেই জল গরম করতে দেওয়া। এক কাপ কফি খেয়েই বাথরুমে দৌড়। তারপর দাড়ি কামানো ও স্নান। শিট, শেভ অ্যান্ড শাওয়ার যাকে বলে। তারপর পোশাক পরে নিতে নিতে স্যান্ডুইচ বানানো। এক ফাঁকে হুড়মুড়িয়ে নিচে গিয়ে ডাকবাক্স খুলে দেখে আসা, কোনও চিঠি এসেছে কিনা। স্যান্ডুইচে কামড় দিতে দিতে আর এক কাপ কফিতে চুমুক। ঘড়ির দিকে চোখ। কফি শেষ না হতেই ছুট ছুট, রাস্তায় সবাই একরকম।

এ-দেশে কেউ ধীর লয়ে হাঁটে না, সবাই ছোটে। সকালবেলা মনে হয়, পুরো দেশটাই ছুটছে।

আজ অফিস যেতে ভাল লাগছে না। কিন্তু যেতেই হবে, হঠাৎ হঠাৎ ছুটি নেবার বিলাসিতা এ-দেশে চলে না।

ঘড়িতে সাতটা দশ, তবু এখনও উঠছে না কেন অবনী? সে ভাবছে, আচ্ছা, আরও দশ মিনিট যাক।

বারো মিনিট বাদে অবনী কম্বলটা সরিয়ে উঠে বসল। মাথাটা প্রচণ্ড ভারি লাগছে, দপদপ করছে। কপালের দু'পাশের শিরা। জ্বর জ্বর লাগছে।

বাথরুমের দরজায় একটা লম্বা আয়না লাগানো আছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, চোখ দুটো বেশ লালচে। তাহলে কি হে ফিভার হল নাকি? আমাদের দেশের মতো এখানেও নানা রকম জ্বর হয়, তার একটার নামে হে ফিভার। কোনও কোনও ফুলের রেণু থেকে নাকি হয়।

আজ শুক্রবার, আজ তো কাজে যেতেই হবে। কাল-পরশু ছুটি।

অতি কষ্টে তৈরি হয়ে নিল অবনী। একেবারেই ইচ্ছে করছে না, তবু না গিয়ে উপায় নেই। টিউব ট্রেনে এই সময়টায় দারুণ ভিড় হয়। গোটা রাস্তাটাই দাঁড়িয়ে যেতে হল অবনীকে।

বাড়ি ফিরতে ফিতে সাতটা বেজে গেল।

টিভিটা খুলতেই শুনল আবহাওয়ার সতর্কবাণী। এর আগের তিন দিন পরিষ্কার আকাশ ছিল। আজ সন্ধে থেকে আবার খুব তুষারপাত শুরু হবে। তুষারঝড় হতে পারে। বিমানবন্দর বন্ধ করে দিতে হবে হয়তো। ট্রেনও চলবেনা।

অবনী জানলার কাছে এসে উঁকি মেরে দেখল, এখন পর্যন্ত তুষারপাতের কোনও চিহ্ন নেই।

জুর একটুও কমেনি। দুটো অ্যাসপিরিন খেয়ে শুয়ে পড়তে হবে। তার আগে কিছু খাদ্য পেটে যাওয়া দরকার। খিদেও পেয়েছে।

ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে অবনী শুধু খানিকটা সুপ আর একটা হটডগ খেয়েছে দুপুরে। তখন খিদে ছিল না। এ-দেশে আমেরিকানরা সন্ধে সাড়ে ছ'টা-সাতটার মধ্যে ডিনার সেরে নেয়।

যাঃ, বাড়িতে যে কিছুই নেই। শুক্রবার সন্ধেবেলায় ফেরার পথে অবনী বাজার করে। আজ সে-কথা মনেই পড়েনি। মাছ-মাংস সব শেষ। ফ্রিজ একেবারে খালি, শুধু রয়েছে কয়েকটা ডিম।

চাল আর ডাল আছে অবশ্য। ডাল-ভাতের সঙ্গে ডিমভাজা খেয়ে নেওয়া যেতে পারে।

এই অবস্থায় রান্না করতে কারুর ইচ্ছে করে? মাঝে মাঝে রেস্তোরাঁতেও খেতে যায় অবনী, আজ আর বেরুবার প্রশ্নই ওঠে না। আহা, আজ যদি কেউ তাকে রান্না করে খাওয়াত!

খানিকক্ষণ শুয়ে রইল অবনী। তারপর একবার চোখ বুজে আসতেই উঠে পড়ল ধড়ফড় করে। একেবারে ঘুমিয়ে পড়লে আর কিছুই খাওয়াই হবে না।

রান্নাঘরে এসে একটা বড় সসপ্যানে চাল-ডাল মিশিয়ে ফেলল। আলাদা ডাল-ভাত রান্নার কী দরকার! খিচুড়ি খেলেই হয়। ডিমও ভাজবে না, ওর মধ্যে সেদ্ধ করতে ফেলে দেবে। ইস, দুএকটা আলুও যদি থাকত! রয়ে গেছে শুধু একটু বাঁধাকপি। এটাও খিচুড়িতে মিশিয়ে দিলে কেমন হয়?

খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়ে অবনী টিভির সামনে বসল।

অফিসের কিছু জরুরি কাজ বাড়িতে নিয়ে এসেছে, এখন আর তাতে মন বসানো সম্ভব নয়। কাল দেখা যাবে।

অবনী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে, তাকে একটা ছোট ঘর দেওয়া হয়েছে, সেটাকে অফিস বলে। তাকে পড়াতেও হয়। ভাগ্যিস কাল-পরশু ছুটি।

টিভি'র দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু দেখছে না। মন চলে গেছে দেশে। এখানে রাত, কলকাতায় এখন সকাল। নভেম্বরের শেষে ওখানে নরম নরম শীত, একটা পাতলা সোয়েটার গায় দিলেই চলে। এখানকার মতো গাদা গাদা গরম পোশাক পরতে হয় না।

রোজ রোজ গেঞ্জি, জামা, তার ওপরে সোয়েটার, জ্যাকেট, ওভারকোট পরতে পরতে বিরক্তি লেগে যায়।

খিচুড়িটা ফুটছে। এই রে, তলায় লেগে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে স্টোভ বন্ধ করতে যেতেই টেলিফোন বেজে উঠল।

একটি অপরিচিত পুরুষকণ্ঠ প্রথমে ইংরিজিতে বলল, কুড আই স্পিক টু মিস্টার অবনী চৌধুরী?

অবনী ইয়েস স্পিকিং বলতেই লোকটি বাংলায় বলল, আমার নাম আনোয়ার হোসেন, আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি লস অ্যাঞ্জেলিসে থাকি। তবে আমার স্ত্রী রেহানার সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে।

অবনী সঙ্গে সঙ্গে বলল, ও হ্যাঁ। আপনার কথাও শুনেছি।

আমরা আজ সকালেই এসেছি, আমার বড় ভাই এখানে থাকেন, তার মেয়ের বিয়ে আগামী কাল।

এখানে, মানে, বোস্টনে এসেছেন?

জি। আমরা শপিং করতে বেরিয়েছিলাম, এখন আপনার বাড়ির কাছেই আছি। আপনি কি সন্ধেবেলা ফ্রি আছেন?

ফ্রি, হ্যাঁ, বাড়িতেই আছি।

আমরা ভাবছিলাম, আপনার যদি অসুবিধা না হয়, কয়েক মিনিটের জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারি। কাল আর সময় পাওয়া যাবে না। পরশুই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

না, কোনও অসুবিধে নেই, চলে আসুন। অবশ্যই চলে আসুন। আমার দরজার কোড নাম্বারটা লিখে নিন।

ঘরদোর সবই অগোছালো হয়ে আছে। কোনও রকমে তাড়াহুড়ো করে একটা ভদ্র চেহারা দেওয়া হল।

এই রে, ওদের কী খেতে দেওয়া হবে? চা, কফি ছাড়া কিছুই নেই। কয়েক মিনিটের জন্য আসছে বলল, নিশ্চয়ই কিছু খেতেই চাইবেনা। বিয়েবাড়ির ব্যস্ততা আছে।

খিচুড়িটা ঢাকা দিয়ে রাখল অবনী। এত গরম অবস্থায় ফ্রিজেও ঢোকানো যাবে না।

সাত-আট মিনিটের মধ্যে ওরা এসে পড়ল।

আনোয়ারকে দেখলেই বোঝা যায় বেশ শক্তসমর্থ পুরষ। মেদহীন শরীর, মাথাভর্তি ঝাঁকড়াচুল। উজ্জ্বল দুটি চোখ। গায়ের রঙ কালো হলেও চকচকে ভাব আছে।

রেহানাকে প্যান্ট-কোট পরা অবস্থায় কখনও দেখেনি অবনী। এ-দেশে এসে এর মধ্যেই আরও ফর্সা হয়ে গেছে নাকি?

স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মুখেই বেশ একটা প্রফুল্ল ভাব আছে।

আনোয়ার অবনীর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, গুড ইভিনিং, কেমন আছেন? আপনার কথা সব শুনেছি। নারায়ণগঞ্জে যে বাড়িটা এক কালে আপনাদের ছিল, সেই বাড়িতেই আমার বিয়ে হয়েছে গত বছর। সেই হিসেবে, আমি আপনাদের বাড়ির জামাই, তাই না?

বলেই হো-হো করে হেসে উঠল আনোয়ার।

অবনীও হেসে বলল, তাই তো হয়। বসুন, বসুন, কোট খুলে ফেলুন।

রেহানা বলল, বেশিক্ষণ বসব না। হঠাৎ ঝড় উঠেছে। আপনার বাসাটা দেখতে এলাম। ফোনে কথা বলেছি।

আনোয়ার বলল, ঘণ্টা খানেক বসতে পারি? কী মশাই, খুব ব্যস্ত না তো?

অবনী বলল, না না, আমার কোনও কাজ নেই এখন।

আনোয়ার ওভারকোটের পকেট থেকে একটা স্কচের বোতল বার করে বলল, একটুখানি পান করব। আমার বড় ভাইয়ের বাসায় এ-সব চলেনা। ওদের গাড়ি আমাদের এখানে নামিয়ে দিয়ে গেল, আমরা একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে যাব। আপনার এতে আপত্তি নেই আশা করি?

এ-দেশে এসে অবনী একটু-আধটু হুইস্কি বা বিয়ার পান করে। নেশা নেই। একা খায় না, বাড়িতে বোতলও রাখে না।

আনোয়ারের সঙ্গে তাকেও খেতে হবে। গায় এত জ্বর, তাছাড়া পেট একেবারে খালি, এই অবস্থায় কি খাওয়া উচিত?

তবু অবনী দুটো গেলাস এনে, রেহানাকে জিজ্ঞেস করল, আপনাকে কী দেব? আনফরচুনেটলি বাড়িতে কোল্ড ড্রিঙ্কস কিছু নেই, চা কিংবা কফি বানিয়ে দেব?

রেহানা জিজ্ঞেস করল, আপনার চোখে কী হয়েছে?

অবনী বলল, চোখে? কিছু হয়নি তো?

রেহানা বলল, চক্ষু দুটো এত লাল?

গেলাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে আনোয়ার মুখ তুলে অবনীকে দেখে বলল, ইউ লুক সিক। আপনার কি শরীর খারাপ নাকি?

অবনী বলল, না না, কিছু হয়নি।

আনোয়ার অবনীর হাতটা চেপে ধরে বলল, বলেন কী মশাই, আপনার তো জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। মিঠু, তুমি দেখো তো।

রেহানা হাত রাখল অবনীর কপালে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, অন্তত একশা চার-পাঁচ জ্বর।

অবনী বলল, ও কিছুনা, এমনি একটু জ্বর হয়েছে। ঠাণ্ডা লেগেছে বোধহয়।

আনোয়ার বলল, মেয়েদের চোখ ফাঁকি দিতে পারবেন না। মিঠু আপনার চোখ দেখেই বুঝেছে।

রেহানা বলল, এই জ্বর নিয়ে আপনি হুইস্কি খেতে যাচ্ছিলেন? খবরদার খাবেন না। ডাক্তার দেখিয়েছেন?

অবনী বলল, এমনিই সাধারণ জ্বর, আজই হয়েছে, অ্যাসপিরিন খেলেই সেরে যাবে।

আনোয়ার স্ত্রীকে বলল, মিঠু, ব্যস্ত হয়ো না। পুরুষমানুষরা অত জ্বর-টর গ্রাহ্য করে না। আর অ্যাসপিরিন এখন ম্যাজিক ড্রাগ, সব অসুখেই কাজে লাগে।

অবনী রেহানাকে বলল, আপনি কী খাবেন, আমি চা-কফি করে দিই?

রেহানা বলল, আপনাকে কিছু করতে হবে না। এক কাপ চা খেতে পারি, কোথায় আছে বলুন আমি বানিয়ে নিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে জানলায় গুম গুম শব্দ হল, সমস্ত বাড়িটা যেন কেঁপে উঠল। প্রবল বেগে আছড়ে পড়েছে ঝড়।

রেহানা বলল, ঝড় বেড়ে গেল। এরপর বাড়ি যাব কী করে? চলো, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি।

আনোয়ার বলল, এর মধ্যে কেউ বেরোয়? ব্যস্ত হয়ো না। ঝড় একটু কমুক!

কিন্তু সে ঝড় কমার আর কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। দারুণ দাপাদাপি করছে প্রকৃতি। টিভিতে শোনা যাচ্ছে, এর মধ্যেই ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে গেছে। আরও আট-ন'ঘন্টা এ-রকম ঝড় ও তুষারপাত চলবে। সমস্ত ট্রেন আর বাস বন্ধ হয়ে গেছে, রাস্তায় অনেক গাড়ি উলটে গেছে।

এখানে ফোন করলেই ট্যাক্সি আসে। আজ যতবার ফোন করা হল, ততবারই একউত্তর, সরি, নট অ্যাভেইলেবল।

একটা সময় বোঝা গেল, আজ আর ওরা দুজন ফিরতে পারবে না। এই অবস্থায় রাস্তায় বেরুনো খুবই বিপজ্জনক। আনোয়ারের দাদার বাড়িতে ফোন করা হলে তারাও বললেন, না ফিরতে।

অবনী দুর্বল গলায় বলল, আমার ছোট ঘরটায় যে-সোফাটি আছে, সেটা টানলে বিছানা হয়ে যায়। আপনাদের খুবই অসুবিধে হবে যদিও..।

আনোয়ার বলল, আরে মশাই, একটা রাত তো। এই দুর্যোগের মধ্যে গাছতলায় যে থাকিনি, তাই তো যথেষ্ট। খাবারদাবার কী আছে বাড়িতে?

রেহানা সসপ্যানের ঢাকনাটা তুলে প্রায় আঁতকে উঠে বলল, অ্যাঁ? আবার খিচুড়ি? তারপর সে হাসিতে ভেঙে পড়ল।

আনোয়ার হাসির কারণটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, অতহাসির কী আছে? খিচুড়ি খারাপ কী? ভাগাভাগি করে খাওয়া যাবে।

হাসি থামিয়ে রেহানা বলল, ফ্রিজ একেবারে খালি। আপনি এত কৃপণ কেন?

অবনীর কাচুমাচু অবস্থা দেখে আনোয়ার বলল, ব্যাচেলারদের এ-রকমই হয়, কখনও ফ্রিজ বেশি ভর্তি থাকে, কখনও একেবারে খালি। তাছাড়া, দেখছ না ভদ্রলোকের অসুখ হয়েছে। বাজারে যেতে পারেননি।

রেহানা বলল, কয়েকটা ডিম আছে। দেখুন, আমি কী চমৎকার ওমলেট বানাতে পারি।

আনোয়ার বলল, চৌধুরীবাবু, আপনি চুপটি করে বসে থাকুন। আপনাকে কিছু করতে হবে না। খিচুড়িটা আমি গরম করে নিচ্ছি। গরম মশল্লা আছে?

সেই খিচুড়ি আর ওমলেটই তৃপ্তি করে খাওয়া হল। এক সময় আনোয়ার আর রেহানা শুতে চলে গেল পাশের ঘরটায়।

আলো নিভিয়ে শুয়ে রইল অবনী। তার ঘুম আসছে না। বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। কাগজে সে পড়েছে, এখানে মাঝে মাঝে এমন ঝড় হয় যে, গাড়ি পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যায়। সমুদ্রের জল উঠে এসে ডুবিয়ে দেয় শহরের রাস্তা-ঘাট।

রেহানা আর আনোয়ার কি ঘুমিয়ে পড়েছে এর মধ্যে? কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

আনোয়ার সম্পর্কে একটু একটু ঈর্ষা হচ্ছে ঠিকই। আবার, আনোয়ার এমনই দিলখোলা, প্রাণবন্ত মানুষ যে, তাকে পছন্দ না করে পারা যায় না।

রেহানা যে একবার তার কপালে হাত রেখেছে, তাই তো যথেষ্ট! নারায়ণগঞ্জে রেহানাদের বাড়িতে অবনী এক রাত কাটিয়েছিল, এখানে অবনীর বাড়িতে পাকেচক্রে রেহানাকে রাত কাটাতে হল। ব্যাস, শোধবোধ হয়ে গেল। অবশ্য, এটা অবনীর নিজের বাড়ি নয়, অস্থায়ী অ্যাপার্টমেন্ট। বর্ধমানের বাড়িটাই কি তার নিজের বাড়ি? সে-বাড়ি আগে ছিল সিরাজুল চৌধুরীদের, তারও আগে ওই জমির মালিক কে ছিল কে জানে।

নারায়ণগঞ্জে বাড়িটাও রেহানাদের নয়, তার পিসেমশাই সিরাজুল চৌধুরীদের। তার আগে ও-বাড়ি ছিল অবনীর বাবার। তারও আগে ওই জমি ছিল অন্য কারুর।

কোনও বাড়িই কি মানুষের ঠিক ঠিক নিজের বাড়ি? সব মানুষই এই পৃথিবীর অতিথি।

২. মায়ের চিঠি

মায়ের চিঠির মধ্যে একটা অন্য চিঠিও এসেছে। অচেনা হাতের লেখা।

চিঠি লেখার অভ্যেস তো চলেই যাচ্ছে, হয় টেলিফোন, নয়তো ই-মেইল। টেলিফোনের চেয়েও ই-মেইল সস্তা। অবশ্য বাংলা ই-মেইল এখনও চালু হয়নি।

মায়ের সঙ্গে সপ্তাহে একদিন কথা হয় ফোনে। তবুমা চিঠি লেখেন। মা চিঠি লিখতে ভালবাসেন। সে-চিঠির উত্তর টেলিফোনে দিলে চলবে না। প্রত্যেক চিঠিতে লেখা থাকে, উত্তর দিবি। টাইপ করে নয়, নিজের হাতে লিখে উত্তর দিবি।

মা কেন হাতে লেখা চিঠি চান, তা বুঝতে পারে অবনী।

টেলিফোনের কথা চার-পাঁচ মিনিটে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু প্রবাসী ছেলের হাতের লেখা চিঠি মা বার বার পড়েন। প্রত্যেকটা চিঠি জমিয়ে রাখেন তার গয়নার বাক্সে। এর আগে অবনী একবার শ্রীলঙ্কা গিয়েছিল, সেখান থেকে দু'খানা চিঠি লিখেছিল মাকে। সে বেশ কয়েক বছর আগের কথা। সেই চিঠি দুটোও মা জমিয়ে রেখেছেন।

আমেরিকায় বসে দিনের পর দিন বাংলা কথা বলারই সুযোগ হয় না। শনি-রবিবার দেখা হয় বাঙালি বন্ধুদের সঙ্গে। বাংলায় কিছু লেখার তো প্রশ্নই নেই।

মা অবশ্য মোটামুটি ইংরেজি জানেন। ইংরেজি ডিটেকটিভ গল্পের বই পড়েন। তবু মাকে ইংরেজিতে চিঠি লেখার কোনও মানে হয় না। মাকে লেখা চিঠিতেই অবনী কোনও ক্রমে বাংলা লেখার অভ্যেসটা বজায় রাখতে পেরেছে।

কিন্তু আজ একই খামে দুটো চিঠি।

অবনী মায়ের চিঠি পড়ার আগে অন্য চিঠিটাই পড়তে গেল। তলায় নাম লেখা, নিশা।

নিশা? এই নামে তো কারুকে চেনে না অবনী!

চিঠিটা এই রকম :

অবনীদা,

আপনি আমার চিঠিটা পেয়ে নিশ্চয়ই অবাক হবেন। আমাকে নিশ্চয়ই মনে নেই আপনার। মনে থাকার কথাও নয়। আপনার মাসতুতো বোন পৃথার আমি বন্ধু, এক সঙ্গে কলেজে পড়েছি। বছর পাঁচেক আগে আমরা চার বন্ধু মিলে আপনাদের বর্ধমানের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ছিলাম দুদিন। আপনি তখন আমাকে দেখেছেন। আমার ডাকনাম খুকু, বন্ধুরা সবাই এই নামেই ডাকে।

এবারে আসল কথায় আসি। জানি, আপনি খুবই ব্যস্ত। তবু বাধ্য হয়েই আপনাকে এই চিঠি লিখছি। আমার বিয়ে হয়েছে সাড়ে চার বছর আগে। আমার স্বামীর নাম অরূপরতন দাস। বিয়ের দু'বছর পর তিনি একটি চাকরি পেয়ে আমেরিকায় চলে যান। চাকরির জন্য তাকে প্রায়ই জায়গা বদল করতে হয়। আমেরিকার বিভিন্ন শহর থেকে তার চিঠি পেয়েছি। শেষ চিঠি পেয়েছি নিউ ইয়র্ক স্টেটের বাফেলো শহর থেকে। পাঁচ মাস আগে। তারপর তার আর কোনও চিঠি আসেনি। ওঁর কোনও খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি জীবিত নেই, শুধু ওঁর এক দাদা-বউদি আছেন, তারাও কোনও খবর জানেন না। এজন্য আমরা দারুণ দুশ্চিন্তায় আছি। দাদা, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি লজ্জিত। ও-দেশে আমার চেনা আর কেউ নেই। আপনি যদি খোঁজখবর নিয়ে ওঁর সন্ধান পান, আমাকে জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

ইতি
প্রণতা নিশা

চিঠিটা পড়ে প্রথমে খানিকটা বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে গেল অবনীর। আমেরিকা দেশটা যে কত বড় তা আমাদের দেশের অনেকেরই ধারণা নেই। আমেরিকা-কানাডা মিলিয়ে একটা

মহাদেশ, এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতে তিন ঘন্টা সময় বদলে যায়। এখানে লক্ষ লক্ষ বাঙালি, তার মধ্যে এক জনকে খুঁজে বার করা সম্ভব? এই অরূপ দাস আবার বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়ায়।

মাঝে মাঝে শোনা যায় এ-রকম কাহিনি। এক-এক জন কীর্তিমান দেশে বিয়ে করে বউকে ফেলে এসে এখানে কোনও বিড়ালাক্ষী বিধুমুখীর সঙ্গে বসবাস শুরু করে। বেচারি স্ত্রীটি কিছু জানতেও পারে না।

এ-ও সেরকম কিছু ব্যাপার নাকি?

অবনীর ভুরু সোজা হয়ে গেল আবার। মেয়েটির মুখটা মনে করার চেষ্টা করল কয়েক মুহূর্ত। তার মাসতুতো বোন পৃথার কয়েকটি মেয়েবন্ধু একবার বর্ধমানের বাড়িতে এসেছিল বটে, তাদের মধ্যে এই মেয়েটি ঠিক কোনটি তা এখন বোঝা মুশকিল। কারুরই নাম মনে নেই।

মায়ের প্রত্যেক চিঠিই ঠিক তার আগের চিঠির মতো। নতুন কথা বিশেষ কিছু থাকে না। তুই কেমন আছিস, ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে তো, শরীরের যত্ন নিবি ইত্যাদি। দেশের খবর এখন আর চিঠি পড়ে জানতে হয় না। ইন্টারনেটে সব খবর পাওয়া যায়।

এবারের চিঠিতে মা নিশার কথা লিখেছেন। তুই একটু খোঁজখবর নিস। মেয়েটা চিন্তায়-ভাবনায় রোগা হয়ে যাচ্ছে। আমার কাছে এসে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল। নিশা খুব ভাল মেয়ে, ওর জন্য আমারও কষ্ট হয়। আমি যা চেয়েছিলাম, তা তো আর হল না।

মায়ের শেষ বাক্যটির মানে কী?

হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মতো একটা কথা মনে পড়ে গেল।

মা কতবার যে অবনীর বিয়ের সম্বন্ধ করতেন, তার ইয়ত্তা নেই। একবার একটি মেয়েকে নিয়ে করা জন্য খুব ঝুলোঝুলি করেছিলেন। সে পৃথারই কোনও সহপাঠিনী। এই মেয়েটিই নয় তো? হ্যাঁ, খুব সম্ভবত এই নিশাই।

অবনী বিয়ের প্রসঙ্গ পাত্তাই দেয়নি কখনও। সেই সময় সে পিএইচডি নিয়ে ব্যস্ত ছিল খুব।

এবারে অবনীর মুখে একটা পাতলা হাসি ফুটে উঠল।

মজারই তো ব্যাপার। যে-মেয়ে তার বউ হলেও হতে পারত, সে এখন তার স্বামীকে খোঁজার জন্য অবনীর সাহায্য চাইছে।

নিশার স্বামী অরূপরতন দাস শেষ চিঠি লিখেছিল বাফেলো থেকে। বাফেলোতে গিয়ে তার খোঁজখবর করা অবনীর পক্ষে সম্ভব নয়। তার এখন দারুণ কাজ। পোস্ট ডক্টরেট করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে এখন পড়াতেও হচ্ছে। এক দিনও ছুটি পাবার উপায় নেই।

চেনাশুনোর মধ্যে একমাত্র রেহানা থাকে বাফেলোতে। কয়েক মাসের মধ্যেই ও চলে যাবে ইস্ট কোস্টে। ওর স্বামীর সঙ্গে থাকতে পারবে এক শহরে। এখন ওরা দুজনে দুই প্রান্তে, টেলিফোনে খরচ হয় প্রচুর।

রেহানাকে তো আর বলা যায় না, তুমি অরূপরতন দাসকে খুঁজে বার করো।

একটা বিয়ারের ক্যান খুলে টিভির সামনে বসল অবনী। এদেশে এসে নিজের অজান্তেই টিভির নেশা হয়ে গেছে তার। কয়েকটা বিশেষ সোপ-সিরিয়াল না দেখলে ভাত হজম হয় না। এক্ষুনি শুরু হবে খবর। অনেকগুলো চ্যানেলেই খবর শোনা যায়, কিন্তু সি বি এস-এ পিটার ফিঞ্চের খবরই বেশি ভাল লাগে অবনীর। এটাও একটা নেশা।

আজ আর রান্নাবান্নার ঝামেলা নেই। কালকের অনেকখানি মাংস রয়ে গেছে। সেটা গরম করে পাঁউরুটি দিয়ে খেয়ে নিলেই হবে।

ফোনটা বেজে উঠতেই টিভি'র আওয়াজ কমিয়ে দিল অবনী।

কী করছিলেন? ব্যস্ত? রেহানার গলা।

অবনী বলল, একেই বলে টেলিপ্যাথি। আমি একটু আগেই তোমার কথা ভাবছিলাম।

ঝির ঝির করে হেসে উঠল রেহানা। হাসতে হাসতে বলল, জানি, কথাটা মোটেই সত্যি নয়। তবু শুনতে ভাল লাগে। একে বলে মধুর মিথ্যে। আপনি বেশ শিখে গেছেন তো।

রেহানা আর তার স্বামী এখানে এক রাত থেকে যাবার পর ওদের সঙ্গে সম্পর্কটা অনেক স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আনোয়ারই জমিয়ে তুলেছিল। এখন বেশ স্বচ্ছন্দে ইয়ার্কি-ঠাট্টা করা যায়। আনোয়ারও ফোন করে মাঝে মাঝে।

অবনী বলল, না, এখনও ভাল করে শিখিনি। যা বললাম, সেটা কিন্তু সত্যি।

রেহানা বলল, সত্যি? তাহলে তো সেটা মোটেই ভাল কথা নয়। সন্ধ্যেবেলা এক জন বিবাহিতা মহিলাকে ধ্যান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এর মধ্যে কোনও গার্ল ফ্রেন্ড জোটাতে পারলেন না?

অবনী বলল, আমার সে-এলেম নেই। মেয়েদের সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে পারি না। তুমি তো কারুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না!

আমি এত দূর থেকে কী করে আলাপ করাব? আপনি তো জহির সাহেবের আড্ডায় যান, ওখানে অনেক মেয়ে আসে শুনেছি। কারুর সঙ্গে ভাব জমাতে পারলেন না?

দু'এক জনের সঙ্গে একটু একটু ভাব হয়। তার পরই অন্য কেউ তাদের নিয়ে চলে যায়। আমি সকলের সঙ্গেই কমপিটিশানে হেরে যাই।

আহা রে, কী দুঃখের কথা! এ-দেশে কারুকেই তো একা থাকতে দেখি না। একা থাকলেই নাকি ডিপ্রেশান হয়। আপনি এক কাজ করুন, দেশে গিয়ে একটি শান্ত-শিষ্ট মেয়েকে বিয়ে করে আনুন।

কিন্তু আমি যে এক সময় প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি, সম্বন্ধ-করা বিয়েতে কখনও রাজি হবনা!

সে-প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলুন। আপনার দ্বারা নিজে নিজে বিয়ে করা কোনও দিন সম্ভবহবে না। সে আমি বুঝে গেছি।

তুমি এরমধ্যে এতখানি বুঝে ফেলেছ? যাকগে, তুমি ফোন করলে...বিশেষ কোনও কারণ আছে কী?

বিনা কারণে বুঝি ফোন করা যায় না? মানুষ মানুষের খবর নেয় না? আপনি তো ভুলেও কখনও নিজে থেকে ফোন করেন না।

আমার অভ্যেস নেই। মনে মনে ভাবি, কিন্তু ফোন আর করা হয়ে ওঠে না।

মনে মনে ভাবলে লোকে জানবে কী করে? টেলিপ্যাথি?

তা-ও তো হয়। এই তো আমি তোমার কথা চিন্তা করছিলাম, অমনি তুমি ফোন করলে।

এবার বলুন, কেন আমার কথা চিন্তা করছিলেন?

সেটা শুনলে তুমি বোধহয় রেগে যাবে।

রেগে যাব? কেন?

মানে ব্যাপারটা অতি সাধারণ। একজন একটা চিঠিতে বাফেলো শহরের কথা লিখেছে। বাফেলো নামটা দেখেই মনে পড়ল তোমার কথা। কারণ, ওখানে শুধু তোমাকেই চিনি।

কোয়াইট ওবভিয়াস। আমার সামনে যদি কেউ বর্ধমান শব্দটা উচ্চারণ করে, আপনার কথাই মনে পড়বে আগে। একে বলে অ্যাসোসিয়েশান! কী লিখেছে বাফেলোর কথা?

সেখানে এক জন থাকে। রেহানা, তুমি কি বাই এনি চান্স ওখানকার অরূপরতন দাস নামে কারুকে চেনো?

ভদ্দরলোক কি গান করেন?

তা আমি জানি না। ইন ফ্যাক্ট, আমি ভদ্রলোককে কখনও দেখিনি। চিনি না। আমার মা এর সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে বলেছেন।

এখানে রফিক নামে আমাদের নারায়ণগঞ্জের একটি ছেলে থাকে। তার ওখানে প্রায়ই গান-বাজনা হয়। সেখানে কলকাতার এক ভদ্রলোক এক দিন অনেকগুলি গান শোনালেন, বেশ ভাল গান করেন, নামটা বোধহয় অরূপ না অপূর্ব কী যেন ঠিক মনে নেই।

তাহলে তুমি কি একবার ওই রফিককে জিজ্ঞেস করবে, সেই গায়কটির নাম অরূপরতন কিনা, আর সে এখনও বাফেলোতে আছে কিনা? যদি তোমার খুব অসুবিধে না হয়- ।

খুবই অসুবিধা হবে। ভূতের ব্যাগার কাকে বলে জানেন?

ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমাকে খোঁজ নিতে হবে না।

এবার আমি কেন ফোন করেছি, বলি? আমি এই শনিবার ওয়াশিংটন ডি সি যাচ্ছি। আনোয়ারও আসবে সেখানে। আনোয়ার আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে, আপনি যাবেন? আপনি তো আমেরিকায় এসে এ পর্যন্ত কিছুই দেখলেন না। এমনকী নায়েগ্রা ফল্সও দেখতে এলেন না।

এই শনিবার? নাঃ, সম্ভব না। অনেক কাজ।

উইক এন্ডেও কাজ? সোমবারও ছুটি। এটা লং উইক এন্ড।

আমার প্রফেসরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে। রবিবার সারা দিন কাটাতে হবে ওঁর সঙ্গে।

তাহলে আপনি কাজই করুন। যেতে হবে না। আজ কী রান্না করেছেন? নাকি আজও খিচুড়ি।

না, কালকের মাংস লেফট ওভার আছে। এবার আমার জিজ্ঞেস করা উচিত, তুমি কী রান্না করেছ, তাইনা?

আমি কিছুই রান্না করিনি। অর্ডার দিয়েছিলাম, এইমাত্র পিৎসা ডেলিভারি দিয়ে গেল।

তাহলে খেয়ে নাও। পিৎসা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খাওয়া যায় না।

ঠিক আছে, বাই- ই।

ফোন রেখে দিল অবনী। এর মধ্যে খবর শেষ হয়ে গেছে টিভিতে। এখন দেখানো হচ্ছে ফুটবল। এই খেলাটা অবনী একেবারে পছন্দ করে না। হাত দিয়ে খেলে, তবু এর নাম ফুটবল?

বিয়ারের ক্যানটা ফুরিয়ে গেছে। আর একটা বিয়ার খাবে কি খাবেনা এই দোনামনা করতে করতে অবনী রান্নার জায়গায় গিয়ে স্টোভটা জ্বালাল। মাংসটা গরম করতে হবে।

প্রবাস জীবনে সব চেয়ে কষ্টকর, এই একা একা খাওয়া।

দেশে খাবার সময় খেতে বসলে মা পাশে দাঁড়াবেনই। তাছাড়াও কেউ না-কেউ এক সঙ্গে বসেই।

এখানে দিনের পর দিন একই রকম নিঃসঙ্গতা। সেই জন্যই যারা একা থাকে, তার সবসময় টিভি চালিয়ে রাখে। তবু তো মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

এর মধ্যে অন্য মনস্ক ভাবে অবনী আর একটা বিয়ার খুলে ফেলেছে।

দেশে থাকতে তার এসব অভ্যেস ছিল না। কিন্তু এখানে বিয়ারকে কেউ মদ বলে গণ্য করেনা। আমেরিকান বিয়ার অবশ্য খুব পাতলা, অ্যালকহল কনটেন্টও কম। অনেকটা জলেরই মতো।

মিনিট দশেকের মধ্যে আবার টেলিফোন বাজল। আবার রেহানা।

সে ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল, এবার শুধু কাজের কথা। রফিককে জিজ্ঞেস করলাম। সেই গায়ক ভদ্রলোকের নাম অরূপরতন দাস ঠিকই। রফিকের সঙ্গে একই বাড়িতে অন্য অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন। কদিন আগে ভদ্রলোকের পা ভেঙে গেছে, প্লাস্টার করে শুয়ে আছেন বাড়িতে। আর কিছু খোঁজ নিতে হবে?

থ্যাঙ্কস। হঠাৎ তুমি ভূতের ব্যাগার খাটতে গেলে কেন?

আপনার মা খোঁজ নিতে বলেছেন, সেটা ভূতের ব্যাগার?

তুমিই তো বললে?

আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন, আমার অসুবিধে হবে কিনা? বেশি বেশি ভদ্রতা! খুব আমেরিকান কায়দা শিখে গেছেন, না?

আমেরিকায় থাকতে গেলে তো কিছু কিছু কায়দা শিখে যেতেই হয়। এসব কথা এমনিই মুখে এসে যায়।

বাঙালিদের মুখে থ্যাঙ্কস শুনতেও আমার ভাল লাগে না।

তুমি কিন্তু সত্যি খুব উপকার করলে রেহানা। শনিবার মাকে ফোন কবব।

আপনার মা ওই ভদ্রলোক সম্পর্কে... বিয়ে-টিয়ের ব্যাপার নাকি?

না না, ভদ্রলোক বিবাহিত। অনেকদিন বাড়িতে চিঠিপত্র লেখেন না। গায়ক মানুষ, খেয়াল থাকে না বোধহয়। তাছাড়া পা ভেঙে শুয়ে আছেন।

পা ভাঙলে চিঠি লেখা যায় না, এমন কখনও শুনিনি। তাছাড়া পা ভাঙলে ফোন করাও যেতে পারে।

তুমি ভদ্রলোকের ফোন নাম্বারটা জোগাড় করে দিতে পারো?

আবার আমার ওপর দায়িত্ব চাপানো হচ্ছে? আমি রফিকের ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, বাকিটা আপনি নিজে ব্যবস্থা করুন মশাই।

সেই ভাল। রফিককে আমি চিনি না। তাকে ফোনে এসব কথা জিজ্ঞেস করলে কিছু মনে করবেন না আশা করি।

রফিকের সঙ্গে আলাপ হলে বুঝবেন, সে হচ্ছে ভদ্রতার প্রতিমূর্তি। খাঁটি জেন্টলম্যান। সেই জন্য বন্ধুরা তার নাম দিয়েছে জেন্টু। বিশ্বসুদ্ধ মানুষের উপকার করার দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে নিয়েছে। দেশ থেকে যারা প্রথম আসে, অনেকেই রফিকের কাছে ওঠে। দু'তিন মাস বিনা পয়সায় খায়-দায়। এখনও তো একটা ছেলে ওর বাসায় আছে।

তাহলে তো ওঁর সঙ্গে আলাপ করতেই হবে। পিৎসা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে তোমার?

এখনও খাচ্ছি।

খাওয়ায় মন দাও। তোমার স্বামীটিকে বলো, এবার যেতে পারলাম না। পরে একবার এক সঙ্গে বেড়াতে যাব। তুমি ভাল করে ঘুরে এসো।

খোদা হাফেজ।

এত সহজে কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে, অবনী আশা করেনি। খবরটা না দিতে পারলে মা প্রত্যেক চিঠিতে একই কথা লিখবেন। নিশা নামের মেয়েটিকে যেন একটু একটু মনে

পড়ছে। বেশ লম্বা, প্রায় ছেলেদের মতো ছোট করে চুল কাটা, চোখ দুটোতে ঘুম ঘুম ভাব। বর্ধমানে বেড়াতে এসে সে-ই তো গান গেয়েছিল।

প্রবাসী স্বামী যদি চিঠি না লেখে, অনেকদিন খোঁজখবর না নেয়, সেটা মেয়েদের পক্ষে অপনামজনক ব্যাপার। লোকে নানা রকম ভাবতে পারে। অরূপরতনের ফোন নাম্বার জানিয়ে দেবে, তারপর নিশা নিজেই ফোন করতে পারবে। এরপর আর অবনী ওদের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না।

খাবারের প্লেটটা হাতে নিয়ে অবনী জানলার কাছে এসে দাঁড়াল।

শীত শেষ হয়ে গেছে। কাগজে-কলমে এখন বসন্ত। তবু দু'দিন আগে হঠাৎ কিছুক্ষণ তুষারপাত হয়েছিল। এখন অবশ্য আর কোথাও বরফ জমে নেই। ফুল ফুটতে শুরু করেছে।

আকাশ খুব নীল। এখানকার বসন্তকালেও গায়ে সোয়েটার পরতে হয়। কলকাতায় নিশ্চয়ই এর মধ্যে বেশ গরম পড়ে গেছে। কত দূরে কলকাতা!

.

০২.

একটা পায়ে পুরো প্লাস্টার, হাঁটতে হয় ক্রাচ নিয়ে। বেশিক্ষণ শুয়ে থাকার ধৈর্য নেই অরূপের। পাঁচমিনিট বই পড়ার পরই উঠে বসে। টিভি খোলে, চ্যানেল বদলে বদলে পছন্দমতো প্রোগ্রাম না পেলে একটা গানের সিডি চালিয়ে দেয়। অন্য সময় সর্বক্ষণ এখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি করা অভ্যেস, এখন বাধ্য হয়ে নিজের ঘরে বন্দি।

একখানা ঘর, সঙ্গে বাথরুম আর রান্নার জায়গা। শোওয়ার আলাদা খাট নেই, সোফাকাম-বেড, এ-দেশে তাকে বলে ড্যাভেনপোর্ট। দিনেরবেলা সেটা গুটিয়ে রাখতে

হয়। ঘরের সব কিছুই এলোমেলে। এরকমই অরূপের স্বভাব। মুখ মোছার পর তোয়ালেটা হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেলে সেখানেই পড়ে থাকে।

বাথরুমে বসে দরজার বেল শুনতে পেল অরূপ।

একা থাকে বলে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে না। দরজা বন্ধ থাকলে শুনতে পেত না বেলের আওয়াজ।

ক্রাচ না নিয়েই এক পায়ে লাফাতে লাফাতে এসে সে দরজা খুলে দিল।

খোলার পর এক মুহূর্তের জন্য তার মুখে একটা ছায়া খেলে গেল। সে অন্য এক জনকে প্রত্যাশা করেছিল।

পরের মুহূর্তেই ঝলমলে হাসি দিয়ে বলল, আসুন, আসুন রফিক সাহেব।

রফিক অরূপের প্রতিবেশী, থাকে নিচের তলার অ্যাপার্টমেন্টে। তার সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা, মাথার চুল পাট করে আঁচড়ানো, সারা বছরই সে পুরো মোজা-জুতো না পরে সে ঘর থেকে বেরোয় না।

তার তুলনায় অরূপ যেন ঠিক বিপরীত। সে বেশ রোগা ও লম্বা, নাকটাও বড়, তবে মুখখানি অসুন্দর নয়, বুদ্ধির ছাপ আছে। মনে হয় যেন চুল আঁচড়ায় না সাতজন্মে, কপালের ওপর এসে পড়ে চুল, কথা বলতে বলতে আঙুল দিয়ে চুল সরানো তার মুদ্রাদোষ। সে বাড়ি থেকে চটি পায়ে বেরিয়ে পড়তে পারে অনায়াসে।

এখন তার মুখে কয়েক দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

ভেতরে এসে রফিক বলল, আপনি আমাকে সাহেব সাহেব বলেন কেন? শুধু রফিকই তো যথেষ্ট।

অরূপ বলল, ঠিক। তাহলে তো আপনি বলাও তো চলে না। এখন থেকে তুমি বলব আমরা।

রফিক বলল, আপনাকে অরূপদা বলে ডাকব। আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়।

অরূপ বলল, আরে, ও-সব বয়স-টয়স ছাড়ো। এ-দেশে সবাই সবাইকে নাম ধরে ডাকে। প্রথম এ-দেশে এসে বাবা-জ্যাঠামশাইয়ের বয়সী লোকেরা যখন কত শুধুনাম ধরে পল কিংবা হ্যারি বলে ডাকতে, খুবঅ স্বস্তি হত। দাঁড়িয়ে কেন, বোসো রফিক!

রফিকের হাতে একটার বড় পেপার ব্যাগ। সেটা নামিয়ে রেখে বলল, আপনার জন্য আলু ফুলকপি, কিছু ভেজিটেবল, কিছু মাছ আর চিকেন নিয়ে এসেছি। আপনি তো শপিং করতে যেতে পারছেন না।

ব্যাগটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে অরূপ বলল, ওরে বাবা, এ তো অনেক জিনিস। বিয়ারও রয়েছে কয়েকটা। সত্যি, তোমার তুলনা নেই। ঠিক মনে করে এসব নিয়ে এসেছ।

আপনি আটকা পড়ে আছেন ঘরের মধ্যে।

আমার স্টক ছিল, ফুরিয়ে এসেছে। আজ সকালেই ভেবেছিলাম তোমাকে রিকোয়েস্ট করব। তার আগেই তুমি নিয়ে এলে? আমার প্রতিবেশী ভাগ্য এমন ভাল। হ্যাঁ, সব মিলিয়ে কত লেগেছে?

সে ঠিক আছে, এমন কিছু নয়।

না, রফিক, তুমি মনে করে নিয়ে এসেছ, এ-জন্যই আমি গ্রেটফুল। দাম নিতে হবে।

ঠিক আছে, পরে দেবেন। আপনি তো দু'চার দিনের মধ্যে বেরুতে পারছেন না। আরও তো কিছু কিছু বাজার লাগবে। আমি হিসেব রাখব।

ঠিক হিসেব রাখতে হবে কিন্তু! দু'বোতল স্কচ এনে দিও। একদম ফুরিয়ে গেছে।

সন্ধের সময় পেলে চলবে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ না হয় কাল পেলেও।

আপনার প্লাস্টার কবে কাটবে?

আরও এক মাস তো লাগবেই। কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার। খুব জোর বেঁচে গেছেন। গাড়িটায় যদি স্পিড বেশি থাকত। আমার আরও এ-রকম অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে আগে। প্রত্যেক বারই বেঁচে যাই। মুচকি মুচকি হাসতে লাগল অরূপ। যেন অ্যাকসিডেন্ট হওয়াটা একটা আনন্দের ব্যাপার। তারপর দুটো বিয়ারের ক্যান তুলে নিল।

রফিক বলল, আমি কিন্তু খাব না এখন।

অরূপ বলল, আরে বোসো, বোসো। অত তাড়া কীসের?

রফিক বলল, একটু তাড়া আছে ঠিকই। তাছাড়া দিনেরবেলা আমি পান করি না।

অরূপ বলল, এ-সবের আবার দিন আর রাত্তির কী! অমৃতে কখনও অরুচি হয়?

দু' জনেই হেসে উঠল। কিন্তু রফিক বসল না।

দরজার কাছে গিয়ে বলল, যখন যা কিছু লাগবে, আমাকে জানাবেন। প্লিজ ডোন্ট হেজিটেট।

অরূপ বলল, আবার আপনি?

রফিক বলল, অভ্যেস হতে দু'এক দিন সময় লাগবে।

রফিক চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করেও আবার ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, রফিক, রফিক, প্লিজ, আর একটা কাজ করে দিতে হবে।

সিঁড়ি থেকে ফিরে এল রফিক।

ড্রয়ার খুলে একটা চেক বার করে রফিকের হাতে দিয়ে বলল, এটা আমার ব্যাঙ্কে জমা করে দেবে প্লিজ?

স্বাভাবিক ভাবেই চেকটায় চোখ বোলাল রফিক। এবং চমকে উঠল। কুড়ি হাজার পাঁচশো ডলার। একসঙ্গে এত টাকা?

অরূপের মুখের দিকে তাকাল।

কিন্তু অরূপ কোনও ব্যাখা দিল না বলে রফিকও ভদ্রতা বজায় রেখে জিজ্ঞেস করল না কিছু।

আবার দরজা বন্ধ করে বিয়ারের ক্যান খুলে সিগারেট ধরাল অরূপ। ঘণ্টা খানেক পরে আবার বেল বাজল। এবারে এসেছে আকাঙ্ক্ষিত অতিথি। উজ্জ্বল হয়ে উঠল অরূপের মুখ।

একটি তরুণী, এ ও বেশ দীর্ঘাঙ্গিনী, একটা সবুজ ঢোলা পোশাক পরা, চুলের রঙ সোনালি, ঠোঁটেও প্রায় ওই রকম কাছাকাছি রঙের লিপস্টিক, দু'দিকে কাঁধে তিনটে ঝোলা ব্যাগ।

অরূপ বলল, হাই সুইটি!

মেয়েটির নাম লিজ, সে-ও হাই বলে নিজের গালটা ফেরাল অরূপের ঠোঁটের দিকে।

তারপর ভেতরে এসে ঝোলা ব্যাগগুলো ছুঁড়ে ফেলে বলল, আই অ্যাম স্টার্ভিং! দারুণ খিদে পেয়েছে। আমি কলিফ্লাওয়ার ফ্রায়েড খাব। আই লাইক ইট সো মাচ!

অরূপ বলল, ফুলকপি ভাজা।

লিজ ইংরিজিতে বলল, হ্যাঁ, পুল-কো-প্পি বাজা! আমি এত ভালবাসি, আগে কখনও খাইনি, এত ভাল লাগে, রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে ভাবছি, অরূপের কাছে গিয়ে ফুলকপি ভাজা খাব।

অরূপ বলল, এই রে, ফুলকপি কি আছে আমার ফ্রিজে?

লিজ বলল, না থাকলে আমি এক দৌড়ে সুপার মার্কেট থেকে কিনে আনব।

অরূপ বলল, না না, আছে।

রফিক একটু আগে দিয়ে গেল।

লিজ বলল, তুমি চুপ করে বসে থাকো। আমি ভেজে ফেলছি।

অরূপ বলল, তুমি পারবে না। আমরা দু'রম ফুলকপি ভাজা খাই। সোজাসুজি ভাজা আর ব্যাসনে ডুবিয়ে ভাজা। তুমি তো দ্বিতীয়টাই পছন্দ করো। তুমি ব্যাসন গুলতে পারবে না।

লিজ বলল, ঠিক পারব। আগের দিন দেখেছি। আমার মাকে ফোন করেছিলাম। তখন বললাম, মা, তুমি কখনও কলিফ্লাওয়ার ফ্রাই করে খেয়েছ? গ্রেট, গ্রেট! মা জিজ্ঞেস করল, রেসিপি কী রে? মা ব্যাসন কাকে বলে বুঝতে পারল না।

অরূপবলল, ব্যাসন তো ইন্ডিয়ান স্টোর ছাড়া পাওয়া যায় না। তোমার মাকে খানিকটা পাঠিয়ে দেব বরং।

রান্নাঘর বলতে কিছু নেই। বাথরুমের পাশে এক চিলতে রান্নার জায়গা, দুটো গ্যাস স্টোভ, সামান্য কিছু বাসনপত্র।

লিজ টপাটপ ফুলকপি কুটে, ব্যাসন গুলে ফেলল। তারপর স্টোভ জ্বেলে কড়াই চাপিয়ে বলল, ডু যু মাইন্ড, যদি আমার পোশাকটা খুলে রাখি? তেল ছিটকে লাগতে পারে।

অরূপ বলল, হ্যাঁ, খুলে রাখো।

লিজ তার লম্বা পোশাকটা খুলে ভাঁজ করে রাখলো সযত্নে। তলায় প্যান্টি ছাড়া আর কিছু নেই। সে ব্রা পরে না, তার স্তন দুটি অতিরিক্ত বড়।

বুক খোলা, তাতে সামান্যতম লজ্জার ভাবও নেই তার। কড়াইতে তেল ঢালতে ঢালতে লিজ বলল, আজ আমাকে পর পর তিনটে ক্লাস নিতে হয়েছে। আ অ্যাম সো টায়ার্ড অ্যান্ড হাংগ্রি।

অরূপ বলল, এই, কপিতে নুন মাখাবে না?

লিজ বলল, ব্যাক সিট ড্রাইভিং-এর মতো তুমি ওখান থেকে নির্দেশ দিও না প্লিজ। ওদিকে গিয়ে বসো। আমি ভেযে নিয়ে আসছি। ব্যাসনে একটু নুন দিয়ে দিয়েছি, তাতে ভাল স্বাদ হয়।

তবু গেল না অরূপ। পেছন থেকে লিজকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে তার ঘাড়ে চুমু খেতে খেতে বলল, তোমার কাছ থেকে যে সরে যেতে ইচ্ছে করে না!

লিজ বলল, এই, এই দুষ্টু ছেলে, ও-রকম করলে কি রান্না হয়? বিরক্ত কোরো না।

অরূপ গান গেয়ে বলল, একটি চুম্বন দাও, সখী একটি চুম্বন দাও।

লিজ মুখ ফেরাল। তার ঠোঁটের বাঁ-কোণে একটি বড় আঁচিল, সেটা ঘিরে কিছু ছোট ছোট লোম। তার মুখখানি অসুন্দর নয়, শুধু ওই একটাই খুঁত। ওইটুকুর জন্যই আমেরিকান যুবকেরা তার সঙ্গে ডেট করে না।

চুম্বনটি সমাপ্ত করার পর লিজ বলল, যাও এবার, আমার ব্যাগটা খুলে দেখো, তোমার জন্য কী এনেছি!

অরূপ ঠিক বুঝতে পেরেছে, সে শুদ্ধভাবে এক পায়ে লাফাতে লাফাতে গিয়ে নিজের ব্যাগ ঘাঁটতে লাগল। দুটো ঝোলা ব্যাগই বই-খাতাপত্রে ভর্তি। লিজ দারুণ পড়াশুনো করে। সোসাল সায়েন্সে পিএইচডি করার পর সে আবার সাইকোলজির কোনও একটা বিষয় নিয়ে পিএইচডি শুরু করছে।

ছোট হ্যান্ডব্যাগটায় পাওয়া গেল একটা পুরিয়া। অরূপ উল্লসিত ভাবে জিজ্ঞেস করল, কোথা থেকে জোগাড় করলে?

লিজ বলল, নিক নামে ছেলেটাকে মনে আছে? সে দিয়েছে। নিয়মিত সাপ্লাই দেবে বলেছে।

অরূপ একটা সিগারেট নিয়ে টিপে টিপে ভেতর থেকে বার করে ফেলল সব তামাক। তারপর তার মধ্যে ভরতে লাগল গাঁজা।

গরম তেলে ফুলকপি ভাজার চড়বড় শব্দ হচ্ছে, আর অরূপ গুন গুন করে গান করতে করতে গাঁজা সাজছে।

সম্পূর্ণ হবার পর সেটা ধরিয়ে লিজের কাছে এসে বলল, এই নাও!

প্রথম টানটা লিজ দেবে। হাত মুঠো করে সে বেশ জোরে টানতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দুটো লাল হয়ে যায়।

লিজ জিজ্ঞেস করল, তুমি উডস্টফের কথা জানো?

অরূপ বলল, হ্যাঁ, জানবনা কেন?

লিজ বলল, উডস্টফের মতোই একটা বিরাট গান-বাজনার আসর হচ্ছে ক্লিভল্যান্ডে, তুমি গান এত ভালবাসো, ওখানে গেলে তোমার খুব ভাল লাগত! কিন্তু ভাঙা পা নিয়ে যাবে কী করে?

অরূপ বলল, ভাঙা পা তো কী হয়েছে? তোমার গাড়িতে যেতে পারি।

পারবে?

অফ কোর্স পারব। কাল সিঁড়ি দিয়ে একবার নিচে নেমেছিলাম। কোনও অসুবিধে হয়নি।

তাহলে চলো, চলো!

তুমি ছুটি পাবে?

অরূপ, আমি ছুটি-ফুটি গ্রাহ্য করিনা। ইচ্ছে হয়েছে, যাব, ব্যাস, সোজা কথা! শুধু একটাই মুশকিল, বেশ কিছু টাকা-পয়সা লাগবে, টিকিটই তিনশো ডলার, তাছাড়া অত দূরে যাওয়া, গাড়ির গ্যাস, খাওয়া-দাওয়া।

টাকার জন্য চিন্তা? কত টাকা লাগবে? আমার হাতে এখন অঢেল টাকা। তুমি টাকার জন্য একদম চিন্তা করবে না লিজ।

তুমি কোথা থেকে টাকা পেলে?

চেকটা এসে গেছে।

এসে গেছে? এত তাড়াতাড়ি। ও গ্রেট, গ্রেট!

একহাতে খুন্তি, সেটা নিয়েই লিজ জড়িয়ে ধরল অরূপকে। দুজনের শরীরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। যেন একটা দারুণ ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে, এই ভাবে হাসতে লাগল ওরা।

অরূপ জিজ্ঞেস করল, ক্লিভল্যান্ডের উৎসবটা শুরু হচ্ছে কবে?

লিজ বলল, পরশু দিন। চলবে তিন দিন। তাহলে কবে যেতে চাও?

অরূপ বলল, আজই। দেরি করে কী লাভ?

লিজ বলল, কিছু জিনিসপত্র কিনে নিতে হবে। কাল সকালে স্টার্ট করা যায়।

অরূপ বলল, না না, আজই। এক্ষুনি! জিনিসপত্র আবার কী? চেকটা জমা পড়ে গেছে। ক্রেডিট কার্ড নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হবে। জিনিসপত্র সব পাওয়া যাবে রাস্তায়। চলো, চলো লিজ। ঘরে আটকে থাকতে আমার আর একটুও ভাল লাগছে না।

পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে ওরা দুজন বেরিয়ে পড়ল দীর্ঘ যাত্রায়।

.

০৩.

ফোনটা বাজতেই অবনী ভাবল রেহানার কথা। এই রকম সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে অবনী রান্নাবান্নার জোগাড় করে, তখনই রেহানা ফোনে নানা রকম উপদেশ দেয়।

ফোনটা তুলে প্রথম গলা শুনে অবনী দারুণ চমকে উঠল। অন্য মেয়ের কণ্ঠস্বর। এ পর্যন্ত রেহানা ছাড়া আর কোনও মেয়ে তাকে নিজে থেকে ফোন কবেনি।

দাদা, আমি নিশা।

নিশা! নিশা মানে?

আপনাকে আমি চিঠি লিখেছিলাম। আপনি উত্তরও দিয়েছিলেন।

ও হ্যাঁ, তুমি কোথা থেকে কথা বলছ?

বোস্টন থেকে।

বোস্টন থেকে! তুমি এখানে কবে এলে?

আজই। এই মাত্র। গ্রে হাউন্ড বাস স্টেশনে এখন রয়েছি।

তুমি আমেরিকায় কবে এসেছ? কিছু খবর পাইনি তো।

আজ সকালেই নিউইয়র্ক পৌঁছেছি। খবর দিতে পারিনি আগে। দাদা, খুব বিপদে পড়ে আপনার সাহায্য চাইছি।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি হঠাৎ আমেরিকা এলে, নিউ ইয়র্ক থেকে এখানে এলে কেন?

সব আপনাকে বুঝিয়ে বলব। এখন কি একবার আপনার বাড়িতে যেতে পারি?

কী করে যাব যদি বুঝিয়ে দেন। ঠিকানাটা আছে আমার কাছে। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললে...।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমার বাড়ি খুঁজে পাওয়া একটু মুশকিল। ট্যাক্সি অনেক ঘোরাবে। তুমি গ্রে হাউন্ড স্টেশনেই থাকো। আমি আসছি।

দাদা, ঠিক আসবেন তো? আমার ভয় করছে।

আরে, ভয়ের কী আছে। গ্রেহাউন্ড স্টেশনে ভয়ের কিছু নেই। আমার পৌঁছতে বড় জোর আধ ঘন্টা লাগবে।

ফোন ছেড়ে দিয়ে জেট বিমানের গতিতে চিন্তা করতে লাগলো অবনী।

এ কী অভাবনীয় ব্যাপার! মেয়েটা হুট করে চলে এল আমেরিকায়? তা ইচ্ছে হলে আসতে পারে, কিন্তু বোস্টনে কেন? ওর স্বামীর টেলিফোন নাম্বার দিয়ে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানেই তো যাওয়া উচিত ছিল।

অবনী এখন কী করবে? সন্ধে হয়ে গেছে, মেয়েটি থাকবে কোথায়?

দেশ থেকে যারা আসে, তারা অনেকেই বোঝেনা যে, এখানে অনেকেই থাকে একঘরের ফ্ল্যাটে। সেখানে কি কোনও অনাত্মীয় মেয়েকে আশ্রয় দেওয়া যায়?

রেহানা এক দিন এখানে ছিল, সে-দিন সঙ্গে তার স্বামীও ছিল। কষ্ট করে শুতে হয়েছে, সেআর কী করা যাবে। কিন্তু একটি বিবাহিতা মেয়ে একা এসেছে, অবনীর ঘরে তাকে আশ্রয় দেবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। দুজনেরই মন পরিশুদ্ধ থাকলেও অন্য কেউ যে তা মানবে না। ওর স্বামী কী মনে করবে? মেয়েটিরই ক্ষতি হবে বেশি।

কিন্তু কথা যখন দিয়ে ফেলেছে, তখন যেতেই হবে গ্রে হাউন্ড স্টেশনে।

এই সময় বাড়ি থেকে বেরুতে ইচ্ছে করেনা একেবারে। জামা-জুতো-মোজা খুলে ফেলা হয়েছে। পরতে হবে আবার।

অবনী যখন গ্রে হাউন্ড বাস স্টেশনে পৌঁছল, তখনও তার চোখে-মুখে বিরক্তি মাখান।

ওয়েটিং রুমে পাঁচ-সাত জন ভারতীয় বা বাংলাদেশি বা পাকিস্তানি রয়েছে, শুধু একজন রমণীর সামনেই একটি বড় সুটকেস। দূর থেকে দেখে অবনী চিনতেও পারল নিশাকে।

প্রথম বার যারা এ-দেশে আসে, তাদের চেহারার মধ্যেই কিছুটা ভয়, উদ্বেগ, অস্বস্তি মিশে থাকে। এয়ারপোর্টে পরিচিত কারুকে না দেখলে সে সব আরও বেড়ে যায়। সেই তুলনায় এই মেয়েটিকে বেশ সপ্রতিভই বলতে হবে।

একা এসেছে নিউইয়র্কে, সেখানে কেউ তাকে অভ্যর্থনা জানায়নি। তারপর সে খোঁজখবর নিয়ে একাই বাসে চেপে বোস্টনে এসেছে। নিশার পরনে সালোয়ার-কামিজ, একটা সাদা রঙের শাল গায়ে জড়ানো।

অবনী সামনে আসতেই নিশা উঠে দাঁড়িয়ে আবেগের সঙ্গে বলল, এসেছেন? অবনীদা, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি খুবই লজ্জিত। যদি আপনি সব শোনেন–।

অনেক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল নিশার দিকে।

পাশের একটি চেয়ার খালি, সেখানে বসে পড়ে অবনী বলো, ঠিক আছে, সব শুনব। একটু আস্তে কথা বলো, এ-দেশে কেউ পাবলিকলি চেঁচিয়ে কথা বলে না। তুমি হঠাৎ চলে এলে, তোমার স্বামীকে জানাওনি? তিনি রিসিভ করতে আসেননি?

নিশা মৃদু গলায় বলল, আপনি আমার চিঠি পাননি?

অবনী বলল, চিঠি... মানে সেই একটা আমার মায়ের চিঠির সঙ্গে...।

নিশা বলল, এখানে আসার কথা জানিয়ে যে একটা চিঠি দিয়েছি দশ দিন আগে।

না, সেটা এখনও পৌঁছয়নি। অনেক সময় দেরি হয়।

আপনাকে টেলিফোন করে পাইনি। টেলিফোনে অনেক খরচ। আজ সকালে নিউইয়র্কে পৌঁছেও চেষ্টা করেছি দু'বার, ফোন বেজেই গেল।

আমি সকালে সাড়ে সাতটার মধ্যে বেরিয়ে যাই। ছুটির দিন ছাড়া পাবে কী করে?

কথা বলতে বলতেও অবনী খুব অস্থির বোধকরছে। নিশা তাকে চিঠি লেখা, তাকে ফোন করার ওপর জোর দিচ্ছে কেন? তার সঙ্গে তো নিশার সেরকম কিছু সম্পর্ক নেই। যোগাযোগ করার কথা তো ওর স্বামীর সঙ্গে। অবনী ওর স্বামীর ঠিকানা ও ফোন নম্বর জানিয়ে দিয়েছে।

অবনী এবার সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, তুমি কি অরূপবাবুকে কিছু না জানিয়েই চলে এসেছ?

সরাসরি অবনীর মুখের দিকে তাকাল নিশা। হঠাৎ জলে ভরে গেল তার দু'চোখ। ফুঁপিয়ে উঠল একবার।

এ-রকম অবস্থায় যে কী করতে হয়, তা অবনী জানেইনা।

অন্য লোকরা কী ভাবছে, এই তরুণীটি তার প্রেমিকা? কী মুশকিল।

ইংরেজি সিনেমায় এই রকম সময়ে পুরষরা একটা রুমাল এগিয়ে দেয় মেয়েটির দিকে। সিনেমার নায়িকারা কান্নার পরেও চোখ মোছেনা, সেই রুমালে নাক ঝাড়ে।

একটু সামলে নিয়ে নিশা বলল, আপনি নাম্বার দিয়েছিলেন, ওর সঙ্গে ফোনে একবার কথা হয়েছে। পা ভেঙে গিয়েছিল তখন ওর। শরীরটাও খারাপ ছিল। তারপর থেকে যতবার ফোন করেছি, ওকে পাইনি। একটা রেকর্ড করা কথা শোনা গেছে, ও বাড়িতে নেই। অন্তত দশবার, প্রত্যেক বার ওই একই কথা।

অবনী বলল, আনসারিং মেশিন। তাতে কোনও মেসেজ রাখোনি? বিপ বিপ শব্দ হওয়ার পর...

নিশা বলল, হ্যাঁ তা-ও রেখেছি। ও নিজে থেকে একবারও ফোন করেনি।

অবনী মাথা নাড়ল। এটা ইদানীং একটা নতুন কায়দা হয়েছে। অনেকে বাড়িতে থাকলেও ফোন ধরেনা। কয়েক বার রিং হবার পর নিজে থেকেই চালু হয়ে যায় আনসারিং মেশিন, যে ফোন করছে শোনা যায় তার কণ্ঠস্বর। তখন ইচ্ছে করলে রিসিভার তুলে কথা শুরু করা যায়। পাওনাদার কিংবা বিরক্তিকর কেউ ফোন করলে, তার কথা শুনতে পেয়েও ফোন না ধরার সুবিধে হয়েছে এখন।

নিশা বলল, নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছি ভোর সাড়ে ছ'টায়। তখন থেকে তিনবার ওকে বাফেলোর নাম্বারে ফোন করেছি, কোনও উত্তর নেই। তখন আমার ভয় হল। অরূপ যদি বাফেলো শহরেই না থাকে এখন, তাহলে আমি ওখানে পৌঁছে উঠব কোথায়? আর তো কারুকে চিনি না।

অবনী মনে মনে বলল, ফোন না ধরলেও বাড়িতে থাকতে পারে।

নিশাকে জিজ্ঞেস করল, অরূপবাবুর সঙ্গে ডেফিনিট যোগাযোগ না করেই তুমি এত দূর চলে এলে? এ যে বিরাট ঝুঁকি!

নিশা আর কাঁদবেনা ঠিক করে ফেলেছে।

ওড়না দিয়ে মুখ মুছে বলল, সবাই বলেছিল, ভিসা পাওয়া খুব শক্ত। আমি আশ্চর্য ভাবে এক চান্সেই ভিসা পেয়ে গেলাম। আমার এক বান্ধবীর দাদার ট্রাভেল এজেন্সি আছে, তিনি আমাকে একটা টিকিট দিয়ে বললেন, একবছরের মধ্যে টাকা শোধ করলেও চলবে।

অবনী বিরক্তি গোপন না করে খানিকটা ধমকের সুরে বলল, শুধু ভিসা আর ফ্রি টিকিট পেলেই হল? অরূপবাবু যদি সত্যিই বাফেলো থেকে অন্য কোথাও চলে গিয়ে থাকেন, তাহলে তুমি থাকবে কোথায়? থেকেই-বা কী করবে?

নিশা বলল, তা বলে একটা মানুষ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে তার কোনও খোঁজ করা হবে না? যদি সত্যি তার কোনও গুরুতর অ্যাকসিডেন্ট হয়ে থাকে? মাসের পর মাস আমি কোনও খবর পাবনা, অথচ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকব? অরূপদের বাড়িতে, মানে আমার শ্বশুর বাড়িতে আমি কীভাবে থাকি, তা আপনারা বুঝতে পারবেন না। আমার মা-বাবা কেউ নেই, দাদার কাছ থাকতাম। বিয়ের পরেও কোনও মেয়ে যদি দাদার বাড়িতে ফিরে গিয়ে আশ্রয় চায়, সেটা তার পক্ষে কত অপমানজনক, সেটুকু অন্তত বুঝবেন আশা করি। শ্বশুর বাড়িতে একগাদা লোক, এখন সবাই ভাবছে, আমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে অরূপের, সেই জন্য সে আর কারুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেনা। অথচ বিশ্বাস করুন, কোনও দিন ঝগড়া হয়নি। বরং ও আমাকে কত রকম প্রমিজ করেছিল। বলেছিল এক বছর বাদেই ডেফিনিটলি আমাকে এ-দেশে নিয়ে আসবে।

তুমি কলকাতায় কিছু কাজ-টাজ করতে?

হ্যাঁ, একটা মিশনারি স্কুলে পড়াতাম। ভাল কাজ ছিল। বিয়ের পর জোর করে ছাড়িয়ে দিল। তখন আপত্তি করিনি। এখন আবার নতুন করে খুঁজতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু সহজে কি চাকরি পাওয়া যায়। এর মধ্যে গত মাসে, অরূপ দুম করে ওর মায়ের নামে এক হাজার ডলার পাঠিয়ে দিয়েছে। চিঠি-টিঠি কিছু নেই, শুধু একটা চেক। তাতেই আরও ওদের ধারণা হয়েছে, অরূপ ওর মায়ের প্রতি কর্তব্য পালন করতে এখন রাজি, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি কোনও কর্তব্য নেই। সবই যেন আমার দোষ। আমার সত্যিই কী দোষ, সেটাই আমি জানতে চাই। সেটা না জেনে আমি মরতেও রাজি নই।

অরূপের যদি খোঁজ না পাওয়া যায়, এ-দেশে একা একা তোমার পক্ষে বেশি দিন থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার। তুমি টুরিস্ট ভিসা নিয়ে এসেছ নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ। দুমাসের।

তার মানে তুমি এ-দেশে কোনও কাজও করতে পারবে না। টাকা-পয়সা কিছু আনতে পেরেছ?

চারশো ডলার। দু'খানা গয়না বিক্রি করে।

নস্যি! ও-টাকায় আর কত দিন চলবে।

আমার রিটার্ন টিকিট আছে। সে-রকম হলে ফিরে যাব। দাদা, আমি আপনার ওপর কোনও দায়িত্ব চাপাতে চাইনা। শুধু পরামর্শ চাইছি। কোথা থেকে আমার শুরু করা উচিত।

আপাতত আজকের রাতটা তুমি কোথায় কাটাবে, সেটা ঠিক করা দরকার। আমার অ্যাপার্টমেন্টে তোমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি ছোট্ট একটা একখানা ঘরের অ্যাপার্টমেন্টে থাকি।

ছোট হলেও আমার কোনও অসুবিধা নেই। আমি মেঝেতেও শুয়ে থাকতে পারি।

তুমি বুঝতে পারছ না, অসুবিধেটা অন্য রকম। কাছাকাছি কিছু সস্তার মোটেল আছে, চলো দেখি, কোনওটাতে যদি ঘর পাওয়া যায়।

ঠেলাগাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে নিশাকে নিয়ে বেরিয়ে এল অবনী। ট্যাক্সি নিয়ে মোটেল খুঁজতে গেলে অনেক খরচ হয়ে যাবে। সে নিশাকে বলল, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক, এমনিতে ভয়ের কিছু নেই, শুধু মালপত্রের কাছ থেকে একমুহূর্তের জন্যও নড়বে না। এটা হাত দিয়ে ধরে থাকো। কেউ কোনও কথা বলতে এলেও মাথা নাড়বে, অন্য দিকে তাকাবে না। ভিখিরি এলেও পয়সা দেবেনা। আমি পায়ে হেঁটে গিয়ে ঘর ঠিক করে আসছি।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে ফিরে এল। ঠেলাগাড়িটা দুহাতে চেপে একই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে নিশা। একটু দূর থেকে তাকে দেখে মনে হল কোনও ট্র্যাজেডির নায়িকা। মুখে গাঢ় অভিমানের রঙ।

এবারে অবনীকেই হাতে করে সুটকেসটা বয়ে নিয়ে যেতে হল। বেশ ভারি।

একেবারেই সস্তার মোটেল, তা-ও কাল দুপুর বারোটা পর্যন্ত। ঘরভাড়া পঁয়তাল্লিশ ডলার। একচিলতে ঘর, অবশ্য সংলগ্ন টয়লেট আছে। মোটেলটির মালিক এক গুজরাটি, কর্মচারীরা সবাই কালো।

ঘরটার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিশা বলল, কোনও দিন হোটেলে একা একা থাকিনি।

অবনী বলল, দরজা বন্ধ করে রাখবে। এখানে খাবার-টাবার পাওয়া যায় না। কেউ এসে তোমাকে ডাকবেও না। তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই?

না, আমার একটুও খিদে নেই।

খিদে না পেলেও খেতে হবে। এখানকার কলের জল খাওয়াও ঠিক নয়। তোমার জেট ল্যাগ হবে, যখন-তখন ঘুম পাবে। আমি কিছু খাবার আর জলের বোতল নিয়ে আসছি। ফিরে এসে আমি তিনবার বেল দেব, তখন দরজা খুলবে।

নিশা হ্যান্ডব্যাগ খুলে টাকা বার করতে গেল।

অবনী বলল, এখন থাক।

নিশা বলল, অবনীদা, আমার জন্য আপনাকে টাকা-পয়সা খরচ করতে হবে না। প্লিজ, কত লাগবে বলুন।

অবনী বলল, শোনো নিশা, আমার উপার্জন বেশি নয়। চাকরি তো করি না। এই হিসেবে এখন আমি ছাত্র। তবে বিদেশ থেকে কোনও অতিথি এলে একসন্ধে তাকে কিছু খাওয়ার সামর্থ্য নিশ্চিত আমার আছে।

কাছেই একটা বার্গার কিং-এর দোকান দেখে এসেছে অবনী। দুটো বড় হ্যামবার্গার, আলুভাজা, দুটো কফি ও দুটো জলের বোতল কিনে নিল। এরা চা কিংবা কফিও এমন ঢাকনা দেওয়া গেলাসে দেয় যে, বয়ে নিয়ে যেতে অসুবিধে হয় না।

এর মধ্যে পোশাক বদলে ফেলেছে নিশা। শাড়ি পরেছে। পোশাক বদলালেই মেয়েদের চেহারা ও রূপও যেন বদলে যায় অনেকখানি। নিশাকে বেশ সুশ্রীই বলতে হবে। তার কথা বলার ভঙ্গিতেও ন্যাকামি নেই, অনেক পুরুষই আকৃষ্ট হতে পারে তার দিকে। তবু এমন একটি মেয়েকে কেন অবহেলা করছে তার স্বামী? সেই লোকটির মনের কথা কী করে বুঝবে অবনী?

একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এ মেয়েটির সাহস আছে। জীবনে যে কখনও বিদেশে যায়নি, সে একা একা, কারুর সঙ্গে সঠিক যোগযোগ না করে আমেরিকায় চলে এল, ক'জন বাঙালি মেয়ে এটা পারবে?

ঘরের মাঝখানে একটি খাট ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই। সেই খাটের ওপর বসেই খাবার খেতে শুরু করল।

হ্যামবার্গারে প্রথম কামড় দিয়ে নিশা জিজ্ঞেস করল, বিফ না পর্ক?

অবনী বলল, কোনওটাই নয়। মুর্গি। তোমার ওই সব মাংসে আপত্তি আছে? এ-দেশে ও-সব সংস্কার থাকলে মেনে চলা খুব মুশকিল। খাচ্ছ নিরীহ আলুভাজা, কিন্তু সেটা যে লার্ড দিয়ে ভাজা, সেটা হয়তো গরুর চর্বি।

নিশা বলল, বিয়ের পর আমার স্বামী কলকাতায় আমাকে পার্ক স্ট্রিটের কয়েকটা রেস্তোরাঁয় খাওয়াতে নিয়ে যেত। প্রায় জোর করেই আমাকে বিফস্টেক খাইয়েছে। অলিম্পিয়াতে এগ অ্যান্ড সসেজও খেয়েছি, সসেজ তো শুয়োরের। যে-কোনও মাংসই আমার ভাল লাগে। শুনেছি, এ-দেশে নাকি পাঠার মাংস পাওয়া যায় না।

অবনী বলল, চেষ্টা করলে পাওয়া যায়। আরও অনেকরকম মাংস পাওয়া যায় এ-দেশে। তোমার সঙ্গে কি অরূপবাবুর সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছে? নাকি তোমরা নিজেরা পছন্দ করে ।

মুখ নিচু করে নিশা বলল, বলতে পারেন, অরূপই আমাকে পছন্দ করেছিল। আমি মাঝে মাঝে কবিতা আবৃত্তি করতাম। একটা আসরে আমার কবিতা শুনে ওর ভাল লাগে। যেচে এসে আলাপ করে আমার সঙ্গে। আমাদের বাড়িতেও আসতে শুরু করে। আমাকে নিয়ে গেছে কয়েকটা গানের আসরে, ও নিজে খুব ভাল গান করে, আমার ভাল লেগেছিল। তারপর যেমন হয় আর কী।

ওর গানের খ্যাতি এখানেও ছড়িয়েছে।

গান কিন্তু শেখেনি কোথাও। কিন্তু গান-পাগল যাকে বলে।

এখানে উনি কী চাকরি নিয়ে এসেছেন?

তা ঠিক জানি না। বলেছিলেন ঘুরেঘুরে বেড়াবার চাকরি। কোনও ইন্ডিয়ানমালিকের কোম্পানিতে।

ওঁর ডিসিপ্লিন কী ছিল?

সোসিওলজিতে এমএ করেছিল। তারপর আরও কী কী ট্রেনিং নিয়েছিল।

উনি শিক্ষিত লোক, তোমার স্কুলে পড়ানোটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন কেন?

ও দেয়নি। ওর মায়ের আপত্তি ছিল খুব।

খুব মাতৃভক্ত ছেলে?

ঠিক তা নয়। আমাদের তো জাতের মিল নেই, তাতেই ওর মা প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। পরে অবশ্য মেনে নেন। সেই জন্যই চাকরির ব্যাপারে আর মায়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করা যায়নি। একটা কোনও কাজ থাকলে তবু আমি...।

আমি তাহলে এখন উঠি?

আমার এখন কী করা উচিত, তা বললেন না তো!

বাফেলোয় অন্য দু'এক জনকে আমি চিনি। তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখি। যদি কেউ কিছু খবর দিতে পারে।

ওখানে আমাকে তো প্রথমে যেতেই হবে।

তা যাবে। কিন্তু অরূপ যদি না-ই থাকে সেখানে, তুমি একলা গিয়ে আরও মুশকিলে পড়ে যাবে।

আমি কাল সকলে কী করব?

উমম... আমি তো কাল সকালেই আসতে পারব না। তুমি ঘুম থেকে উঠে তৈরি-টৈরি হয়ে নিয়ে ঘর বন্ধ করে বেরুবে। রাস্তাটা ক্রস করলেই দেখবে ডান দিকে একটা বার্গার কিং-এর দোকান। ওরা খুব ভোরেই খোলে। ব্রেকফার্স্ট খেয়ে নেবে। পারবে না? কাল শুক্রবার, আমরা তো এখানে হুট করে ছুটি নিতে পারি না, ইউনিভার্সিটি যেতেইহবে। সাড়ে দশটা-এগারোটার মধ্যে চলে আসব।

আপনার অসুবিধে হলে আরও দেরিতে আসতে পারেন।

দুপুর বারোটায় তোমার চেকিং আউট টাইম। যদি কালকেই বাফেলো যেতে হয়...ঠিক আছে, সেটা কাল এসে ঠিক করব। আমার ফোন নাম্বার তো তুমিই জানোই, রাত্তিরে কোনওরকম অসুবিধে হলে আমাকে ফোন করবে।

অবনীদা, আমি কি এ-রকম ভাবে এসে পড়ে খুব ভুল করেছি?

এসেই যখন পড়েছ, তখন আর ওকথা ভেবে লাভ নেই। এরপর কী হবে, সেটাই এখন ভাবতে হবে।

দরজা পর্যন্ত অবনীর সঙ্গে এগিয়ে এল নিশা।

সামনের লম্বা করিডরটা একেবারে শূন্য। একটা মাত্র মৃদু আলো জ্বলছে। এমনই নিঃশব্দ যে, মনে হয় ধারেকাছে আর একটিও মানুষ নেই।

অবনী বলল, হয়তো কাল অনেক বেলা পর্যন্তও তোমার ঘুম ভাঙবে না। জেট ল্যাগে এ-রকম হয়। ঘুমোতে ইচ্ছে করলে ঘুমিয়েই থেকো।

নিশা অন্য রকম গলায় ডাকল, অবনীদা-।

আর কিছু বলল না।

অবনী মুখ ফিরিয়ে দেখল, আবার নিশার দুচোখের কোণে চিকচিক করছে অশ্রু। ঠোঁটটা একটু একটু কাঁপছে।

এক লহমার জন্য অবনীর মনে হল, মেয়েটি কি চাইছে, আমি ওকে একটা চুমু খাব?

পরে মুহূর্তেই সে ভাবল, না না, তা কী করে হয়! এ পর্যন্ত সে নিশার হাতও ছোঁয়নি। তার সঙ্গে কোনও রকম অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নেই, তবু কি চুমু খাওয়া যায়? এ-দেশে অবশ্য ও-সব কিছু সম্পর্ক লাগেনা, এক ঘন্টার পরিচয়ে ছেলেরা-মেয়েরা বিছানায় চলে যায়। কিন্তু নিশা তো এ-দেশের মেয়ে নয়। আর অবনীরও ও-রকম অভিজ্ঞতা এ পর্যন্ত হয়নি।

তবে কি শুধু কৃতজ্ঞতার জন্য?

আর কিছু বলছেনা নিশা, অবনীও শোনার অপেক্ষা না করে এগিয়ে গেল। সে টের পাচ্ছে বুকের মধ্যে একটা আলোড়ন। শরীর যেন হঠাৎ জেগে উঠে নিজস্ব আবেদন জানাচ্ছে, আর একটু হলেই একটা কিছু ঘটে যেত।

বাইরে বেরিয়ে আসার পর অবনীর মনে হল, এই মেয়েটি তার স্ত্রী হলেও তো হতে পারত। তাহলে ওর জীবন হত অন্য রকম। এমন অপমানের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ওকে আসতে হত না এ-দেশে।

নিশাও কি সেই কথাই ভাবছে?

.

০৪.

বাড়ি ফিরতে ফিরতে এগারোটা বেজে গেল।

এত রাতে কি কারুকে টেলিফোন করা যায়? অথচ বাফেলোতে খোঁজ নেওয়া বিশেষ দরকার। যত দেরি হবে, ততই নিশাকে মোটেলের ঘরভাড়া গুণতে হবে। বাফেলোতে

ওকে আদৌ যেতে হবে কি না, সেটাই তো এখনও বোঝা যাচ্ছে না। মাত্র চারশো ডলার সম্বল করে বেচারি এসেছে এই দেশে।

বোস্টনেও অনেক বিবাহিত বাঙালি পরিবার আছে। সে-রকম কোনও পরিবারে নিশাকে কয়েক দিনের জন্য আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সে-রকম কোনও পরিবারের সঙ্গেই অবনীর ঘনিষ্ঠতা নেই। অনেকেই বাড়িতে অতিথি এসে থাকতে শুরু করলে আড়ালে বিরক্তি প্রকাশ করে। একমাত্র জহিরভাই এই ঘটনাটা কোনও ক্রমে জানতে পারলেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। কিন্তু জহির আর সীতা ঢাকা-কলকাতায় গেছেন গত সপ্তাহে।

নিশার স্বামীর হদিশ যদি শেষ পর্যন্ত না পাওয়া যায়, তাহলে ওকে দেশেই ফিরে যেতে হবে। কোথায়? সেই শ্বশুর বাড়িতেই। সেখানে তার অবস্থা এরপর আরও খারাপ হয়ে যাবে না? যে-মেয়েকে তার স্বামী ত্যাগ করেছে, স্বামীর বাবা-মা তাকে কী চোখে দেখবে?

অবনী এত সব ভাবছে কেন?

এই উটকো ঝামেলার জন্য অবনী যতটা বিরক্ত হয়েছিল প্রথমে, এখন তা অনেক কমে গেছে, মেয়েটিকে দেখার পর তার মন নরম হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। নিশার তো কোনও দোষ নেই, তবু সে কেন কষ্ট ও অপমান সহ্য করবে?

না না, যাই-ই হোক না কেন, অবনী ওর দায়িত্ব নিতে পারবে না।

আনিসারিং মেশিন চালিয়ে দেখল, হ্যাঁ, রেহানা ঠিক ফোন করেছিল। মেসেজ রেখেছে, ফিরে এলেই ফোন করবেন।

কিন্তু সে তো সাতটার সময়। এখন নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে রেহানা। ছুটির দিন ছাড়া কেউ এখানে বেশি রাত জাগে না।

রেহানা অবশ্য এক দিন রাত পৌনে বারোটায় সময় ফোন করে আকাশে ঈদের চাঁদ দেখতে বলেছিল।

দ্বিধা কাটিয়ে ফোন তুলল অবনী। ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

আমি কি প্যাঁচা যে, মাঝরাত্তিরে জেগে থাকব?

এখনও ঠিক মাঝ রাত হয়নি। তুমি ফোন করতে বলেছিলে।

এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

সে একটা ব্যাপার হয়েছে। তোমার ধৈর্য থাকলে শোনাতে পারি। তার আগে বলো, তুমি কেন ফোন ব্যাক করতে বলেছিলে? জরুরি কিছু?

তেমন জরুরি নয়, অন্তত আপনার পক্ষে নয়। আমার হাজব্যান্ড আনোয়ার বোস্টনে যাচ্ছে আগামী কাল, দুদিন থাকবে। ও জানতে চেয়েছে, আপনি ফ্রি থাকবেন কিনা, তাহলে আপনার সঙ্গে এক সন্ধে আড্ডা দেবে। আসল কথা, ওর চাচার বাড়িতে তো ড্রিঙ্কিং চলে না, তাই আপনার ওখানে-।

হ্যাঁ, আমি ফ্রি থাকব। আনোয়ার বোস্টনে আসছে, তুমি আসবে না?

আমার ক্লাস রয়েছে! আনোয়ার ওখান থেকে বাফেলোতে এসে কয়েক দিন থেকে যাবে। তাই আমি আর যাচ্ছি না। আপনি চলে আসুন না আনোয়ারের সঙ্গে।

তোমরা কপোত-কপোতী অনেক দিন পর একসঙ্গে থাকবে, এর মধ্যে আমি গিয়ে কী করব? টু ইজ কম্পানি, থ্রি ইজ ক্রাউড। একটা ফরাসি কথাও আছে, মেনাজে ত্রোয়া!

আর ফরাসি ঝাড়তে হবে না। আমাদের বিয়ে হয়েছে সাড়ে পাঁচ বছর আগে, এখনও কপোত কপোতী? আপনাকে আসতে হবে না। এক বছর হয়ে গেল, এর মধ্যেও নায়েগ্রা

ফলস দেখেননি, এ-রকম বেরসিক আর এক জনও আছে কিনা জানি না। এবারে বলুন, আজ সন্ধেবেলা কী ঘটল?

সেটা বলতে খানিকটা সময় লেগে যাবে। তুমি ঘুমোচ্ছিলে, ঘুমোও। কাল বরং –।

আমি ঘুমোচ্ছিলাম না। টিভিতে একটা ফিল্ম দেখছিলাম। খুব সাংঘাতিক ভূতের গল্প। ভয়ও করছিল, ছাড়াও যাচ্ছিল না। এখন বন্ধ করে দিয়েছি।

রেহানা, ওই যে অরূপ নামে ভদ্রলোক তোমাদের ওখানে থাকেন, তার স্ত্রী আজ হঠাৎ দেশ থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে। বার বার ফোন করেও অরূপের কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। আপাতত মেয়েটি এখানকার একটা মোটেলে আছে।

নিশার কাহিনিটি পুরোটাই শোনাতে হল।

রেহানা চুপ করে শোনবার পর বলল, ভদ্রলোককে আমি দু'দিন আগেও দেখেছি সুপার মার্কেটে, অনেক বাজার করলেন, এর মধ্যে কি বাফেলো ছেড়ে চলে গেলেন? ঠিক আছে, আমি খবর নিয়ে জানাব।

কাল সকালে আমি সাড়ে সাতটার মধ্যে বেরিয়ে যাব।

আপনি এখন ফোন রাখুন।

ঠিক দশ মিনিট বাদে আবার বেজে উঠল ফোন। রেহানা বলল, আমি রফিককে ফোন করে অনেক খবর জেনে নিয়েছি। ভাল করে শুনে নিন।

অবনী সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, ছি ছি, এত রাতে তুমি রফিককে বিরক্ত করলে? কাল সকালে–।

রেহানা বলল, রফিককে জাগাতে হয় না। ওকে সবাই বলে রাত রফিক। ইনসমনিয়ার রুগি। আমরা বলি, বিয়ে না করলে ওর এ রোগ সারবে না! শুনুন, রফিক বলল, ওই

অরূপনামে ভদ্দরলোক এমনিতে বেশ ভাল, চমৎকার গান করেন, খুব মজার, কিন্তু খেয়ালি ধরনের। বাঙালি ছাড়াও অন্য বন্ধু-বান্ধবী আছে। হঠাৎ হঠাৎ কোথায় যেন চলে যান। মনে হয়, বাঁধা কোনও চাকরি করেন না। কিছু দিন আগে কোথা থেকে যেন অনেক টাকা পেয়ে গেছেন, দু'হাতে ওড়াচ্ছেন। কাল থেকে এঁর অ্যাপার্টমেন্ট বন্ধ, গাড়িটাও নেই, আবার কোথাও গেছেন মনে হচ্ছে, কিন্তু অ্যাপার্টমেন্ট তো ছাড়েননি। আবার ফিরে আসবেন।

নিশা তাহলে এখন কী করবে?

ওকে বাফেলোতে পাঠিয়ে দিন।

অরূপের অ্যাপার্টমেন্ট বন্ধ। নিশা গিয়ে উঠবে কোথায়?

আপাতত আমার কাছে।

তোমার কাছে? পাগল নাকি?

এর মধ্যে পাগলামির কী হল?

আনোয়ার সাহেব যাচ্ছেন তোমার কাছে। এর মধ্যে আবার এক জন অতিথি, না না, এটা ঠিক নয়।

একটি মেয়ে বিপদে পড়েছে, তাকে যদি আমি সাহায্য না করি, তাহলে কি আমি মানুষ? না জন্তু? আনোয়ারই জানতে পারলে আমার ওপর রাগ করবে। ওসব কথা ছাড়ুন। ভদ্রমহিলা কি একা একা ট্রাভেল করতে পারবেন? না হলে আনোয়ারের সঙ্গে ওকে পাঠিয়ে দিন। এখানকার দায়িত্ব আমার।

একা ট্রাভল করতে পারে।

বাসে তুলে দিয়ে আমাকে জানাবেন। আমি এখানে রিসিভ করে নেব। এর মধ্যে রফিক ওর হাজব্যান্ডের খোঁজখবর নেবে। ভদ্রলোক এমন ইরেসপনসিবল কেন?

আমি তো তাকে চিনিই না।

ওর স্ত্রী, তাকে চিনতেন আগে থেকে, ওদের বিয়েতে অ্যাটেন্ড করেননি? আগেই চলে এসেছিলেন?

তা ঠিক নয়। একে আমি মাত্র একবারই দেখেছি।

ঠিক আছে, এখানে পাঠিয়ে দিন। তারপর সব দায়িত্ব আমার। গুড নাইট। খোদা হাফিজ।

অবনীও অজান্তে বলে ফেলল, খোদা হাফেজ। ফোন ছেড়ে দিয়ে কয়েক মিনিট সে রেহানার কথাই ভাবল।

আশ্চর্য মেয়ে। অদম্য এর প্রাণশক্তি। চেনে না, শোনে না, অথচ একটি মেয়ে অসুবিধেয় পড়েছে শুনেই তার দায়িত্ব নিয়ে নিল স্বেচ্ছায়।

এরপর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেও অনেকক্ষণ ঘুম এল না অবনীর। মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ খচ খচ করছে। যেন নিজের ঘাড় থেকে দায়িত্ব নামিয়ে নিশাকে সে তুলে দিল রেহানার হাতে। যদিও রেহানাকে সে জোর করেনি, কোনও ইঙ্গিতও দেয়নি। অবশ্য, একটি মেয়ে হয়ে রেহানা যতটা সাহায্য করতে পারবে নিশাকে, তা অবনীর পক্ষে সম্ভব নয়।

সকালে ঘুম থেকে উঠতে খানিকটা দেরি হয়ে গেল।

অন্য কোনও দিন এ-রকম দেরি হলে সে ছোটাছুটি শুরু করে। দাড়ি কামাতে কামাতে কফিতে চুমুক দেয়, দাঁত মাজতে মাজেতে প্যান্ট পরে। আজ সে-রকম ইচ্ছে করল না।

অলস ভাবে দু'কাপ কফি শেষ করার পর সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, আজ আর ইউনিভার্সিটিতে যাবেই না। গত এক বছরে সে এ-রকম এক দিনও করেনি।

একটা টেলিফোন করে জানিয়ে দিল তার প্রফেসারকে। তারপর তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল আধ ঘণ্টার মধ্যে।

মোটেলটায় এসে, লম্বা করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তার বুকটা ধক করে উঠল। কী হয়েছে?

এক জায়গায় দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিশা। চুল আঁচড়ায়নি, মুখখানা যেন রক্তশূন্য। যেন সর্বস্ব লুঠ হয়ে গেছে তার।

অবনী জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার? এখানে দাঁড়িয়ে আছ?

নিশা কোনও উত্তর দিল না।

অবনী আরও উৎকণ্ঠিত ভাবে বলল, কী হয়েছে? রাত্তিরে কোনও বিপদ হয়েছে?

নিশা তবু চুপ।

এবার অবনী তার বাহু ছুঁয়ে বলল, কী হয়েছে, বলো আমাকে।

নিশা এবার বলল, আমার মরে যাওয়াই উচিত।

অবনী মৃদু ধমক দিয়ে বলল, এ-সব কী ছেলেমানুষের মতো কথা? যা হয়েছে খুলে বলো, বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

নিশা অবনত মুখে বলল, চাবিটা... চাবিটা ভেতরে রেখে দরজা বন্ধ করে ফেলেছি।

এবারে অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে অবনী বলল, এই ব্যাপার? এটা এমন কিছু নয়। রিসেপশান কাউন্টারে গিয়ে বললে না কেন? ওদের কাছে মাস্টার কী থাকে, ওরা এসে খুলে দেবে।

নিশা তবু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

অবনী বলল, দাঁড়াও, আমি চাবি নিয়ে আসছি। প্রথম প্রথম অনেকেরই এই ভুল হয়।

নিশা বলল, অবনীদা, অবনীদা, এখন আমি কী করব? আমার সব শেষ হয়ে গেছে।

রাত্তিরবেলার মতো জায়গাটা এখন আর তেমন নির্জন নয়। দু'চারজন লোক যাতায়াত করছে, দেখছে আড়চোখে। তবে, এ-দেশে কেউ এ-রকম দৃশ্য দেখলেও থমকে দাঁড়ায় না, কোনও মন্তব্য করে না।

অবনী বলল, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি চাবি আনছি।

দরজা খোলবার পর অবনী নিশার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এসে বলল, শান্ত হও, চোখ মোছো, কী হয়েছে, আস্তে আস্তে খুলে বলো।

খাটে বসতে গিয়েও কাত হয়ে নিচে পড়ে গেল নিশা। আর উঠল না। সেই অবস্থাতেই বলল, আমার আর কিছু নেই, যা বোকামি করেছি, তাতে আমার এখন মরে যাওয়াই উচিত।

অবনী বলল, শোনো, আগে তোমাকে আমি একটা ভাল খবর দিচ্ছি। আমি এর মধ্যে খবর নিয়েছি, তোমার স্বামী এখনও বাফেলো শহরেই থাকেন। বোধহয় দু'এক দিনের জন্য বাইরে গেছেন, কিন্তু অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়েননি। তুমি আপাতত ওখানে একটি মেয়ের বাড়িতে থাকতে পারবে।

একথা শুনেও নিশাশূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

অবনী জিজ্ঞেস করল, ঘুম থেকে উঠে চা কিংবা কফি খেয়েছ? তোমাকে বলেছিলাম, রাস্তার উলটো দিকেই দোকান।

আবার পাগলের মতো কান্না শুরু করল নিশা।

সকালবেলাতেই কোনও মেয়ের এমন কান্নাকাটির দৃশ্য অবনীরমতো একজন অবিবাহিত পুরুষের একেবারেই অভিজ্ঞতার বাইরে।

ধমক দিতে গিয়েও সামলে নিয়ে সে নরম গলায় বলল, শুধু কাঁদলে আমি বুঝব কী করে যে কী হয়েছে? তোমাকে কালকে তো বেশ স্মার্ট মেয়ে মনে হয়েছিল।

এরপর নিশা আস্তে আস্তে যে-ঘটনা বলল, তা শুনে অবনীকেও বেশ কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে যেতে হল।

রাত্তিরে একেবারেই ঘুম হয়নি নিশার।

ভোরের আলো ফুটতে না-ফুটতেই তার চা খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। অত সকালে দোকান খোলে কিনা তা সে বুঝতে পারেনি। তাই খানিকটা দেরি করে অবনীর নির্দেশ মতো বাইরে বেরিয়ে দেখতে পেয়েছিল বার্গার কিং। সকালবেলাতেই সেখানে বেশ ভিড়। কত রকম খাবার! ফ্রুট জুসই সাত রকম। চমৎকার কফির গন্ধ। সে একটা ফ্রুট জুস, এক প্লেট আলুভাজা আর কফি নিয়ে বসেছিল একটা টেবিলে। সে-টেবিলে আর এক জন লোক কাগজ পড়ছিল। চোখাচোখি হতে একবার শুধু হাই, মরনিং বলে আর কোনও কথা বলেনি। কফিটা শেষ করার পর নিশার শরীরটা বেশ চাঙ্গা লাগল। সেখানে কত রকম মানুষ, কত রকম পোশাক, দেখতেও ভাল লাগে। আর এক কাপ কফি খেতে ইচ্ছে হল নিশার। যে-কোন কিছু কিনতে গেলেই লাইন দিতে হয়।

একটু পরে কফি নিয়ে ফিরে এসে নিশা দেখল, টেবিলের ওপর রাখা তার হ্যান্ডব্যাগটা নেই। কাগজ-পড়া লোকটিও নেই!

সেই হ্যান্ডব্যাগেই তার পাসপোর্ট, টিকিট এবং সব ডলার।

সকালবেলায় কোনও মানুষই তেমন সাবধান হয় না। চুরি-ডাকাতির কথা মনে পড়ে না। ওসব যেন অন্ধকারের ব্যাপার। আদিম কাল থেকেই মানুষের মনের মধ্যে রয়ে গেছে অন্ধকার-ভীতি। সব রকম বিপদ অন্ধকারের সঙ্গে জড়িত।

দীর্ঘ বিমানযাত্রা, সারা রাত ঘুম নেই, ভবিষ্যতের উদ্বেগ, এইসব মিলিয়ে নিশার মাথাটা স্বাভাবিক ছিল না। সাহেবদের দেশে, এমন প্রকাশ্যে সকালের আলোয় কেউ যে তার হ্যান্ডব্যাগটা তুলে নিয়ে যেতে পারে, এটা তার কল্পনাতেই আসেনি।

যে-নোটবইতে অবনীর ফোন নাম্বার লেখা ছিল, সেটাও ছিল ওই হ্যান্ড ব্যাগের মধ্যে। অবনীকে ফোন করারও কোনও উপায় ছিল না নিশার।

সেই দোকানের কাউন্টারে গিয়ে নিশা জানিয়েছিল তার ব্যাগ খোওয়া যাওয়ার কথা। অল্পবয়সী মেয়েরা সেখানে কাজ করে, তারা শুনে শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়েছিল। খদ্দের সামলাতে তারা ব্যস্ত, সহানুভূতি জানাবারও সময় নেই। পাশের টেবিলে বসেছিল কয়েক জন, নিশা তাদের জিজ্ঞেস করেছিল সেই কাগজ-পড়া লোকটির কথা। তার কোনও কথা না বলে এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছে, এসব ব্যাপারে মাথা গলাতে চায় না কেউ।

ধাতস্থ হতে কয়েক মিনিট সময় লাগল অবনীর।

এর আগেও এ-রকম দু'একটা ঘটনা শুনেছে অবনী। এয়ারপোর্ট থেকে বেরুতে না-বেরুতেই চুরি হয়ে গেছে সব কিছু। নিশা তো তবু অনেকটা সামলে এসেছিল।

অবনী যদি ইউনিভার্সিটিতে চলে যেত, তাহলে এগারোটা-সাড়ে এগারোটার আগে তার পক্ষে এখানে আসা সম্ভব হত না। ততক্ষণ কী করত নিশা? ওই রকম দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, না কি হঠাৎ ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত কোনও চলন্ত গাড়ির নিচে? অবনী বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল না কেন? সে কি অবচেতনে কোনও তরঙ্গে নিশার এই বিপদের কথা টের পেয়েছিল?

এখন নিশাকে বকুনি দেবার কোনও মানে হয় না। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। থানায় একটা খবর দিতে হবে অবশ্যই, যদিও ওই ব্যাগ আর ফিরে পাবার বিন্দুমাত্র আশা নেই।

নিশার মাথায় হাত রেখে সে বলল, কেঁদো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

দু'হাতে অবনীর হাঁটু জড়িয়ে ধরল নিশা।

অবনীর শরীর শির শির করে উঠল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিল না। আস্তে আস্তে বলল, নতুন পাসপোর্ট করা এমন কিছু ঝামেলার ব্যাপার নয়। তাছাড়া তোমার এক্ষুনি লাগবে না। এ-দেশে একবার ঢুকে পড়লে আর কেউ পাসপোর্ট দেখতে চায়না। টিকিটও ডুপ্লিকেট পাওয়া যাবে, কমপিউটারে তো তোমার নাম আছে। শুধু চারশো ডলার। এ-দেশে এমন কিছু নয়। আর দামি কিছু ছিল না তো?

নিশা দু'দিকে মাথা নাড়ল।

অবনী বলল, আমার কাছে ক্রেডিট কার্ড আছে, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। অরূপবাবুর খোঁজ পাওয়া গেছে, এটাই তো সব চেয়ে বড় কথা। পরে ওঁকে বোলো, আমার টাকাটা শোধ করে দিতে। এখন তৈরি হয়ে নাও, আমি তোমাকে টিকিট কেটে বাফেলোর বাসে তুলে দেব। ওখানে রেহানা নামে একটি বাংলাদেশের মেয়ে আছে, আলাপ করলে তোমার খুব ভাল লাগবে। সে তোমার স্বামীকে খবর দেবার চেষ্টা করছে, যদি তিনি শহরে এখন না থাকেন রেহানা নিজে তোমাকে বাস স্টেশনে রিসিভ করবে। কোনও ভয় নেই, কোনও চিন্তা নেই।

নিশা মুখ তুলে বলল, অবনীদা, আপনি না থাকলে আমি কী করতাম এখন?

এক ঘণ্টা বাদে মোটেলের ভাড়া মিটিয়ে নিশাকে বাসে তুলে দিল অবনী। বাসটা ওখানে এক পাক ঘুরে আবার সামনে দিয়ে যায়, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। জানলার কাঁচে নিশাব মুখ। কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

সেই মুখখানা সারা দিন তার মন জুড়ে রইল।

.

০৫.

রেহানার কাছে দু'দিন থাকল নিশা।

তার হ্যান্ডব্যাগ চুরি নিয়ে এমন ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে লাগল রেহানা যে, নিশার মন খারাপের কোনও অবকাশই রইল না।

প্রথম দিনেই দু'জনের তুমি তুমি সম্পর্ক হয়ে গেল। যেন কত কালের চেনা।

রেহানা বলল, ব্যাগ চুরি গেলে সব চেয়ে বেশি ক্ষতি কী হয় জানো? টাকা-পয়সার ক্ষতির চেয়েও, দু'দিন-তিন দিন পর্যন্ত মুখখানা বোকা বোকা হয়ে থাকে। অনেক শিক্ষিত মহিলাকেও তখন দেখে মনে হয়, যেন একটুও লেখাপড়া জানে না, গাঁইয়া বলদ!

নিশা জিজ্ঞেস করল, তুমি কী করে জানলে? তুমি কি এ-রকম কারুকে দেখেছ?

রেহানা বলল, আমার নিজেরই তো একবার ব্যাগ চুরি গিয়েছিল। তখন আয়নায় মুখ দেখেছি।

তারপর দুজনেরই কী হাসি!

রেহানার কাছে সে বাংলাদেশের গল্প শোনে।

নিশার বাবা-মায়েরও বাড়ি ছিল আগেকার পূর্ববঙ্গে, জায়গাটার নাম নরসিংদি, এইটুকুই শুধু নিশা জানে, সে-জায়গা সে দেখেনি, কখনও বাংলাদেশে যায়নি।

রেহানা তাকে বাংলাদেশে বেড়াতে নিয়ে যাবে। রবিবার, ছুটির দিন, দুপুরের দিকে একটা ফোন এল। ফোন ধরল রেহানা।

একটি পুরুষকণ্ঠ বলল, নমস্কার, আমার নাম অরূপতন দাস, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, হঠাৎ ফোন করছি, আশা করি বিরক্ত হবেন না। আমার প্রতিবেশী রফিক একটা খবর দিল, জানি না প্র্যাকটিকাল জোক কি না, তবু জিজ্ঞেস করছি, আমার স্ত্রী নাকি আপনার কাছে আছে?

রেহানা বলল, আলাপ না হলেও আপনাকে আমি চিনি, আপনার গান শুনেছি। আপনার স্ত্রী কি হারিয়ে গেছে?

অরূপ বলল, সে হারিয়ে গেছে, না আমি হারিয়ে গেছি, তা বলা মুশকিল। সত্যি কথা বলতে কী, মাঝে মাঝে আমি নিজেকে খুঁজে পাই না।

রেহানা বলল, আমার কাছে একটি মেয়ে এসে রয়েছে। সে আপনার স্ত্রী কিনা প্রমাণ দিতে হবে। প্রমাণ না পেলে তো যার-তার হাতে তুলে দিতে পারি না।

অরূপ বলল, প্রমাণ না পেলে আমিই-বা যে-কোনও মেয়েকে নিজের স্ত্রী হিসেবে মেনে নেব কী করে? তার সঙ্গে কি একটু কথা বলা যেতে পাবে?

রেহানা বলল, সেটুকু অনুমতি দেওয়া যায়।

নিশা ফোন ধরে শান্ত গলায় বলল, তুমি কেমন আছো? তোমার পা ভেঙেছিল?

দারুণ আবেগের সঙ্গে অরূপ বলল, নিশা? তুমি সত্যিই এ-দেশে এসেছ? কী আশ্চর্য! আমাকে আগে খবর দাওনি?

নিশা বলল, তুমি আমার চিঠি পাওনি? টেলিফোনও করেছিলাম।

অরূপ বলল, না, চিঠি তো পাইনি। কয়েক দিন আমি শহরে ছিলাম না। ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি, তোমাকে নিয়ে আসব।

ঠিক পনেরো মিনিটের মধ্যে গাড়ি নিয়ে চল এল অরূপ।

ঘরে ঢুকে, রেহানার সঙ্গে কথা বলার আগেই সাড়ম্বরে জড়িয়ে ধরল নিশাকে। গালে গাল ঠেকিয়ে চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত।

তারপর বলল, হোয়াট আ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ! দারুণ কাণ্ড করেছ নিশা। তুমি যে এত স্মার্ট মেয়ে আমি বুঝিনি। বেশ করেছ, খুব ভাল করেছ। আমি নিজেই তোমাকে- ।

অরূপের পরনে জিনসের প্যান্ট, জিন্‌সেরই শার্ট, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় লম্বা চুলের প্রান্তে একটা গিট বাঁধা। স্বামীর এ-রকম চেহারা আগে দেখেনি নিশা।

রেহানা বলল, অরূপবাবু, আপনার সুন্দরী স্ত্রীটিকে খুব সাবধানে আগলে রাখতে হয়েছিল, পাছে অন্য কেউ নজর দেয়।

অরূপ রেহানার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাকে মনে হচ্ছে আমার স্ত্রীর যমজ। আপনি অনায়াসে আমার শ্যালিকা হতে পারেন। নিশার আর কোনও বোন নেই, এই নিয়ে আমার খুব দুঃখ

রেহানা বলল, ঠিক আছে, আর দুঃখ করার দরকার নেই। কী খাবেন বলুন?

অরূপ বলল, আপনি খুব ভাল ওমলেট বানাতে পারেন শুনেছি, সেই একটা টেস্ট করে দেখতে চাই।

আপনি কী করে জানলেন?

রফিকের কাছ থেকে আপনার সব খোঁজখবর নিয়েছি। আপনার স্বামী তো আজই আসছেন।

অনেক খবর নিয়েছেন দেখছি।

আপনার অ্যাপার্টমেন্টটা তো ভারি সুন্দর। জানলা দিয়ে অনেকখানি ফাঁকা, মনে হচ্ছে যেন ক্যানাডা পর্যন্ত দেখা যায়। ঢাকাতে আপনার কোথায় বাড়ি?

ঢাকা!

একবার গান গাইতে গিয়েছিলাম। বিয়ের আগে। খুব ফ্যাসিনেটিং শহর। আমার বউকে আপনি কী করে চিনলেন?

আপনি এখানে ছিলেন না। এক জন কমন ফ্রেন্ড খবর দিল, তাই নিশাকে এখানে এনে রেখেছি।

সব কথা পরে শুনব। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানানো উচিত। অনেক মানে কত? একের পিঠে চারটে শূন্য দিলে হবে?

আরও দুটো শূন্য যোগ করুন। তাতেও ঠিক শোধ হবে না। এক দিন ভাল করে অনেকক্ষণ গান শোনাতে হবে। আর নিশা রান্না করে খাওয়াবে।

গ্রান্টেড। আপনার স্বামী এসে পড়বে, এখন আমাদের চটপট কেটে পড়াই উচিত। নিশা সব গুছিয়ে নাও।

অরূপের গাড়িটা ঝরঝরে, এ-দেশে যাকে বলে জ্যালোপি। ধোয়-টোয় না কোনওদিন। চালায় খুব জোরে।

গুন গুন করে গান গাইছে অরূপ, দেশের কথা, বাবা-মা কেমন আছেন, কিছুই জিজ্ঞেস করল না। মাঝেমাঝে শুধু বলতে লাগল, চিনে রাখো, এই সুপার মার্কেটে আমরা বাজার করি, এখানে মশলাপাতি সস্তা, আর কোণের ওই দোকানটা বাংলাদেশিদের, ওখানে টাটকা মাছ পাওয়া যায়। আমাদের বাড়িতে ওয়াসিং মেশিন নেই, এই লন্ডোম্যাটে জামা-কাপড় কাঁচতে হবে।

বাড়িটা তিন তলা, অরূপের ঘর সব চেয়ে ওপরে, অ্যান্টিকে। লিফ্ট নেই। অত বড় সুটকেস সে সিঁড়ি দিয়ে টেনে তুলবে? অরূপের পায়ে এখনও একটু একটু ব্যথা আছে।

সে কাচুমাচু মুখ করে বলল, নিশা, তুমি কি এটা তুলতে পারবে? আমি তুলতে গেলে যদি আবার খোঁচ-টোঁচ লেগে যায়।

নিশা বলল, না না, তুমি হাত দিও না, আমি পারব।

বেশ কষ্ট হচ্ছে নিশার।

দো-তলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল রফিক। উজ্জ্বল মুখ করে বলল, ইনিই বুঝি ভাবী?

অরূপ বলল, ভাবীটাবী কিছুনা। ওর নাম নিশা, ওর নাম ধরেই ডাকবে।

রফিক বলল, এত বড় সুটকেস, দিন, দিন! আমাকে দিন।

অরূপ বলল, নিজের বউকে দিয়ে সুটকেস বওয়াচ্ছি, লোকে ভাববে আমি একটা পাষণ্ড। কিন্তু আমার যে পায়ে এখন ব্যথা।

রফিক বলল, জানি তো! আমি তুলে দিচ্ছি।

অরূপ বলল, চিনে রাখো, এই হচ্ছে পরপোকারী রফিক। যখন যা অসুবিধে হবে, বিনা দ্বিধায় এর শরণাপন্ন হবে।

নিশা কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল রফিকের দিকে।

রফিক বলল, আমি দো-তলায়, আপনাদের পদতলেই আছি!

চাবি দিয়ে দরজা খুলে অরূপ বলল, এসো রফিক, এক কাপ কফি খেয়ে যাও।

রফিক বলল, না, আমি এখন দৌড়োব। অলরেডি লেট করে ফেলেছি। ভাবী, আপনার সাথে পরে আলাপ হবে। আসি। নিশা মাথা হেলাল।

যে-সব মেয়ে স্বামীর পেছনে কাপড়ের পুঁটুলির মতো দাঁড়িয়ে থাকে, নতুন কারুর সঙ্গে আলাপ হলেও কথা বলতে পারে না, নিশা সে-রকম নয়। সে নিজেই অনুভব করল, রফিকের সঙ্গে কিছু বলা উচিত ছিল, অন্তত ধন্যবাদ জানানো, কিন্তু কিছুতেই সে আড়ষ্টতা কাটাতে পারছে না।

যথারীতি ঘরের মধ্যে সব জিনিসপত্র এলোমেলো ভাবে ছড়ান।

অরূপ বলল, এই তোমার নতুন সংসার। এবার নিজের মতো করে গুছিয়ে নাও। ওঃ, কত দিন পরে আবার সংসারী হচ্ছি।

ফ্রিজ খুলে সে একটা বিয়ারের ক্যান বার করল।

নিশার মনে হচ্ছে, সে যেন অন্য কারুর বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছে। অরূপ যে মাসের পর মাস চিঠি লেখেনি, চিঠির উত্তরও দেয়নি, টেলিফোন ধরেনি, তার কোনও চিহ্ন নেই তার ব্যবহারে। যেন সে নিশার প্রতীক্ষাতেই বসে ছিল।

তবু নিশা অনুভব করছে, অরূপের ব্যবহারে কেমন যেন একটা সূক্ষ্ম কৃত্রিমতা আছে। ঘরের ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে রইল নিশা।

অরূপ বলল, অ্যাপার্টমেন্টটা ছোট, পরে একটা বড় জায়গায় যাব ঠিক করে ফেলেছি।

নিশা বলল, আমি একটা কথা বলব?

বলো!

শুনলে তুমি রাগ করবে, তবু আমাকে বলতেই হবে।

রাগ করব? আগে শুনি!

আমি হ্যান্ডব্যাগটা হারিয়ে ফেলেছি। তার মধ্যে আমার পাসপোর্ট, টিকিট, চারশো ডলার, সব গেছে! আমারই বোকামির জন্য।

হ্যান্ডব্যাগ হারিয়েছে। এতে রাগ করব কেন? বেশ করেছ! যারা সব জিনিস ঠিকঠাক করে, জিনিসপত্র সামলে রাখে, কখনও কিছু হারায় না, তাদের সঙ্গে আমার একটুও মেলে না। মোটে চারশো ডলার? ফুঃ!

সাইড পকেট থেকে একটা মোটাসোটা পার্স বার করে সেটা নিশার হাতে দিয়ে বলল, এটা রাখো, অনেক টাকা আছে, যেমন ইচ্ছে খরচ করবে!

তারপর সে আপন মনে, নাচের ভঙ্গিতে বলতে লাগল, ব্যাগ হারিয়েছে, ব্যাগ হারিয়েছে, হা-হা হা-হা!

দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল নিশাকে। চুমু দিল, যাকে বলে প্রগাঢ় চুম্বন। শুরু হল আদর। টানতে টানতে নিয়ে গেল সোফার ওপর।

শারীরিক মিলনে উদ্বোধন হল এই নতুন সংসারের। দিন সাতেকের মধ্যে এই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেল নিশা।

সে এখন একা একা রাস্তায় বেরোয়। দোকানে কেনাকাটি করে। সে দেশে কিছু দিন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়িয়েছে, ইংরিজি বলতে তার অসুবিধে হয় না।

অরূপ যখন-তখন বেরিয়ে যায়। কোথায় যায়, বলে না। আবার কখনও ঘণ্টার পর ঘন্টা টেবিলে বসে লেখালেখি করে, সে ইংরিজিতে একটা উপন্যাস লিখতে শুরু করেছে। একটা কমপিউটার এনেছে, তবু হাতেই লেখে, এক-এক সময় অনেকগুলো পাতা ছিঁড়ে ফেলে।

সেই ছেঁড়া টুকরোগুলো উড়তে থাকে ঘরের মধ্যে।

বাড়িতে থাকলে সর্বক্ষণই সে বিয়ার খায়, গাঁজা খায়। বেশি রাতে হুইস্কি নিয়েও বসে, তখন নেশার ঝোঁকে গান গায়, বিড় বিড় করে আপন মনে বকে।

এক-একসময় নিশা যে ঘরের মধ্যে আছে, তা যেন সে গ্রাহ্যই করে না। টেলিফোনে কারুর সঙ্গে গল্প করে বহুক্ষণ।

নিশা বুঝতে পারে, তার স্বামী এত দিনের দূরত্বে তার কাছে এখন অনেকখানি অচেনা হয়ে গেছে। নিশার সঙ্গে অবশ্য সে খারাপ ব্যবহার করে না। সংসার নিয়ে মাথা ঘামায় না।

শুধু একরাত্তিরে, অরূপ মদের বোতল পাশে নিয়ে লেখার টেবিলে অনেকক্ষণ ধরে ব্যস্ত, একটাও কথা বলছে না, একা একা টিভি দেখে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশা। হঠাৎ অরূপ তাকে এক ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে জড়িত গলায় জিজ্ঞেস করল, অ্যাই, তুই কে রে?

ধরমড় করে উঠে বসল নিশা।

অরূপ আবার জিজ্ঞেস করল, তুই কে? আমার বিছানায় শুয়ে আছিস কেন?

নিশা বলল, তুমি কী বলছ?

অরূপ ধমক দিয়ে বলল, কী বলছি, শুনতে পাচ্ছিস না? কানে কালা? তুই কে?

আমি নিশা। তোমার স্ত্রী।

আমার স্ত্রী! আমি আবার বিয়ে করলাম কবে?

তোমার নেশা হয়ে গেছে!

আলবাৎ নেশা হবে! কারুর বাপের টাকায় নেশা করি না। গায়ে খেটে, হা-হা-হা-হা, নিজের শরীর দিয়ে রোজগার করি।

তুমি এবার শুয়ে পড়ো প্লিজ!

শোবো? তোর পাশে? তুই কে, তা না জেনে?

নেশা করলে কি মানুষের চোখের দৃষ্টিও নষ্ট হয়ে যায়? ভাল করে তাকিয়ে দেখো, আমি নিশা।

নিশা? নেশা! আমার কি নিশা হয়েছে, না নেশা হয়েছে? ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার নিশা নামে একটা বউ আছে। ভাল মেয়ে। সুন্দর মেয়ে। কিন্তু সে তো ইন্ডিয়ায়, এখানে আসবে কী করে? কেনইবা এখানে আসতে যাবে? এখানে কিছু নেই। ফক্কা! কেন এখানে এসেছিস?

এসেছি তোমার জন্য!

আমার জন্য? আমি, আমি অরূপ দাস, একটা বিফল মানুষ। আমি মরে যেতেও পারতাম। জীবন নিয়ে জুয়া খেলেছি। নিশার মতো একটা সরল, পবিত্র মেয়ে আমার কাছে কী পাবে? আমার কেন পা ভেঙেছিল জানো? আমার একটাও পয়সা ছিল না, নট আ সিংগল ডাইম, হা-হা-হা-হা, কেউ বুঝতে পারেনি, ড্যাম ইট, আমি বেঁচে আছি কেন, কেন, কেন?

হঠাৎ নিশাকে ছেড়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল অরূপ।

প্রথমে ভেবেছিল, এ-সব মাতালের প্রলাপ, এখন নিশা আরও ভয় পেয়ে গেল। মানুষটা পাগল হয়ে গেছে নাকি? এত জোর মাথা ঠুকছে যে দুম দুম শব্দ হচ্ছে, সেই সঙ্গে কাঁদছে অরূপ।

নিশা উঠে গিয়ে জোর করে টেনে হিঁচড়ে তাকে শুইয়ে দিল বিছানায়। একটা তোয়ালে ভিজিয়ে এনে মুছে দিল মুখ। তখনও অরূপ অবোধ শিশুর মতো কেঁদেই চলেছে, কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

সকালে সে আবার স্বাভাবিক মানুষ। আগের রাতের কথা উল্লেখও করল না একবারও।

নিশাও কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেল না।

প্রথম দিন অরূপ যে-রকম প্রবল ভাবে শারীরিক আদর করেছিল নিশাকে, তারপর আর একবারও তাকে সে-রকম ভাবে স্পর্শ করেনি। কিছু একটা যেন দুশ্চিন্তা তার মাথা জুড়ে আছে।

রফিক আসে মাঝে মাঝে। তখন বেশ স্বাভাবিক ভাবে গল্প হয়। রফিক দারুণ গান ভালবাসে, এলেই অরূপকে কোনও না-কোনও গান শোনাবার জন্য ফরমাস করে। অরূপ গান গায়। এখন সে ইংরিজি গানও বেশ গাইতে পারে। কয়েকটা বাউল গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত ইংরিজিতে অনুবাদ করেছে, স্থানীয় টেলিভিশনেও এক দিন অরূপ সেইসব গান গেয়েছে।

এক দুপুরে বেল শুনে নিশা দরজা খুলে দেখল, একটি লম্বা মতো আমেরিকান মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার দু'কাঁধে কয়েকখানা ঝোলা ব্যাগ, মাথার চুল উলুস ঝুলুস, ঠোঁটের এক কোণে একটা বড় আঁচিল।

দু'জনেই দু'জনকে দেখে কয়েক মুহূর্ত থমকে রইল।

তারপর লিজই আগে খানিকটা যান্ত্রিক ভাবে বলল, হাই! আই অ্যাম লিজ সেগান।

অরূপ টেবিলে বসে লিখছিল, উঠে এসে বলল, লিজ! কাম অন ইন। মিট মাই ওয়াইফ নিশা।

ওয়াইফ কথাটা শুনে লিজের মুখে সামান্য একটা ছায়া খেলে গেল। তার পরই সে নিশার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, গ্ল্যাড টু মিট ইউ।

অরূপ জিজ্ঞেস করল, লিজ, তুমি মেরিল্যান্ড থেকে কবে ফিরলে? অনেক দিন তোমার পাত্তা নেই।

লিজ বলল, আজই সকালে। মা অসুস্থ ছিল, তাই থেকে যেতে হল। মা এখন ভাল আছে।

অরূপ নিশাকে বলল, নিশা, এই আমার বান্ধবী লিজ। ওর কাছে আমি স্প্যানিশ ভাষা শিখছি।

নিশা বলল, আপনি বসুন। একটু চা কিংবা কফি খাবেন?

অরূপ বলল, ও চা-কফি একদম খায় না। বিয়ার দিচ্ছি।

লিজ নিশাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি বেঙ্গলি? ক্যালকাটা থেকে আসছেন? বেঙ্গলি হলে নিশ্চয়ই ফুলকপি ভাজা করতে পারেন? এক্ষুনি খেতে পারি।

দু'চার মিনিট কথার পর নিশা ফুলকপি ভাজতে গেল, আর অরূপ সিগারেটে ভরতে লাগল গাঁজা।

অরূপের জোরাজুরিতে নিশা এর মধ্যে দু'একবার গাঁজা-সিগারেটে টান দিয়ে দেখেছে, তার সহ্য হয়নি। তার বেদম কাশি হয়। এরপর অনেকক্ষণ ধরে লিজ আর অরূপ গাঁজা টানতে টানতে গল্প করতে লাগল নিজেদের মধ্যে, নিশাকে পাত্তাই দিল না।

তারপর দুজনেই এক সঙ্গে বেরিয়ে গেল সন্ধের সময়

পরদিন দুপুরে প্রায় ওই একই সময় বেজে উঠল টেলিফোন। নিশা ফোন তুলে শুনল স্ত্রীকণ্ঠ। লিজ। সে জিজ্ঞেস করল, নিশা, তুমি কি খুব ব্যস্ত আছ? আমি একবার তোমার ওখানে আসতে পারি?

অরূপ দশটার সময় বেরিয়ে গেছে, লাঞ্চ খেতেও আসেনি।

সে বলল, অরূপ তো এখন বাড়িতে নেই।

লিজ বল, অরূপ নেই তা জানি, আমি তোমার সঙ্গেই কয়েকটা কথা বলতে চাই। আসব?

এসো।

আজ লিজের চুল আঁচড়ানো, স্কার্ট-ব্লাউজ পরা, মুখখানায় বেশ শান্ত ভাব। অতগুলো ঝোলা ব্যাগ নেই। একটা দামি পারফিউম ও এক বাক্স ভাল সাবান এনেছে।

সেগুলো নিশার হাতে দিয়ে বলল, আমি দুঃখিত, কাল তোমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলা হয়নি। অত দূর থেকে তুমি আমাদের দেশে এসেছ, তোমাকে ওয়েলকাম করা উচিত ছিল। এক-এক দিন আমার মাথার ঠিক থাকে না। তোমার কেমন লাগছে এ-দেশে?

নিশা শুকনো ভাবে বলল, ভালই তো।

দেশের জন্য মন কেমন করছে না? আমি শুনেছি, ও-দেশ থেকে যারা নতুন আসে, তার প্রথম কিছু দিন হোম সিকনেসে ভোগে।

দেশের জন্য? হ্যাঁ, মন কেমন করে। যদিও দেশে আমার আপন জন বলতে বিশেষ কেউ নেই।

আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে এসেছি নিশা। কী করে শুরু করব, বুঝতে পারছি না। একটা অনুরোধ করব? আমি যা বলব, তুমি বিশ্বাস করবে? আই হেট টু টেল লাইজ।

শুধু শুধু তুমি দুপুরবেলা মিথ্যে কথা বলতে আসবে কেন? আমি তো তোমার কাছে কিছু জানতে চাইনি।

তবু আমার বলা দরকার। অরূপ আমার বেশ কিছু দিনের বন্ধু। ও নানা রকম গান করে। গান ভালবাসে খুব, সেখানেই আমাদের মিল। মানুষ হিসেবেও খুব ইন্টারেস্টিং। কিন্তু ও যে বিবাহিত, সেকথা আমাকে কোনও দিন ঘুণাক্ষরেও বলেনি। আমি ওর বাড়ির কথা অনেক বার জানতে চেয়েছি। ও অনেক লোকের কথা বলেছে, কিন্তু নিজের স্ত্রীর অস্তিত্বের কথা উচ্চারণও করেনি।

হয়তো আমার কথা ভুলেই যেতে চেয়েছিল। আমি জোর করে এখানে এসেছি। জানি না, সেটা আমারই ভুল হয়েছে কি না।

সেটা তোমাদের দুজনের ব্যাপার। কিন্তু সে-জন্যে আমি কোনও কারণ হতে চাইনা। পৃথিবীতে বিবাহিত লোকেরা অনেকেই বউয়ের কথা গোপন করে অন্য মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, প্রেম করে, এমনকী শয্যাসঙ্গীও হয়, এটা এমন কিছু নতুন ব্যাপার নয়। বিবাহিত মেয়েরাও কি এরকম করেনা? বিয়ে জিনিসটাই তো একটা কৃত্রিম সামাজিক বন্ধন! আমি ও জিনিসটার কানাকড়িও মূল্য দিইনা।

সেটা তোমাদের দেশে সম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশে- ।

শোনো নিশা, বিয়ে হোক বা না থোক, কোনও নারীর কাছ থেকেই তার পুরুষকে আমি কেড়ে নিতে চাই না। সেটা আমার রুচিতে বাধে। তাছাড়া মিথ্যে কথা বলে ও আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গেল কেন? কাল আমি আগে থেকেই একটু নেশা করে এসেছিলাম, তখন মাথার ঠিক থাকে না। ঠিক খেয়াল করিনি। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হল, অরূপের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ। এটা একশো ভাগ সত্য। আগে যা হয়েছে, সেটা যদি তুমি মেনে নিতে পারো, তবে আমি বলছি, আমার দিক থেকে তোমার কোনও রকম বিপদ হবার সম্ভবনা নেই। এরপর অরূপ আমার কাছে গেলে আমি তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেব।

নিশা চুপ করে রইল।

লিজ নিশার বাহু ছুঁয়ে আবেগের সঙ্গে বলল, এটা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে।

নিশা কী বলবে, ভেবে পেল না।

লিজ আবার বলল, তুমি একটি মেয়ে, আমিও একটি মেয়ে, আমি জীবনে কক্ষনও কোনও মেয়ের ক্ষতি করবনা। পুরুষরা এখনও কত রকম ভাবে মেয়েদের দমিয়ে রাখে, তার পরে মেয়েরাও যদি মেয়েদের সঙ্গে শত্রুতা করে, তাহলে আমরা ওদের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়াব কী করে?

ধন্যবাদ, লিজ।

এখনও বিশ্বাস করছনা?

করছি।

অরূপ মানুষটা ঠিক খারাপ নয় কিন্তু-। অনেকগুণ আছে। এক-এক জন মানুষ বোধহয় একাকিত্বের অসুখ নিয়ে জন্মায়। কিছুতেই সেটা ঘোচে না। তাই তারা এক-এক সময় ছটফট করে, হিংস্র হয়ে ওঠে, অনেকের মধ্যে নিজেকে লুকোতে চায়, অরূপও সে-রকম। আমি ছাড়াও ওর আরও বান্ধবী আছে। মার্থা নামে একটা মেয়েকে নিয়েও কদিন খুব মেতে উঠেছিল। কিন্তু আমি জানি, কারুর সঙ্গেই ওর গভীর সম্পর্ক হয় না, সবই ওপর ওপর, সব সময় অস্থির। তোমাকে একটা কথা বলব নিশা? শুধু এক জন মানুষের স্ত্রী হয়ে থাকা ছাড়াও তোমার একটা নিজস্ব অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা উচিত। তোমার একটা আলাদা পরিচয়। তাহলে অরূপও তোমাকে সম্মান করতে বাধ্য হবে।

সেকথা আমিও অনেক বার ভেবেছি।

তুমি একটা কিছু কোর্স নাও। বাড়িতে বসে থেকো না। অথবা পৃথিবীতে একটি নতুন শিশুকে নিয়ে এসো।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে লিজ বলল, আমি বেশি বেশি কথা বলছি, না? বক্তৃতার মতো শোনাচ্ছে? মাস্টারি করি তো! আমি ক্লাসে ভাল পড়াই। আবার আমার মধ্যেও সব কিছু ভাঙার একটা প্রবণতা আছে। নিজেকেও ভাঙতে চাই। সবরকম নিয়ম ভাঙতে চাই। বোধহয় সেই জন্যই নেশা করা –। চলি, আমার কাজ আছে।

দরজার কাছে গিয়ে সে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে তোমার বন্ধু বলে গণ্য করলে খুব খুশি হব।

.

০৬.

পর পর দুদিন অরূপ প্রায় একটাও কথা বলল না নিশার সঙ্গে।

কখনও সে লিখছে, কখনও পায়চারি করছে ঘরের মধ্যে, অথবা ঝুপ করে শুয়ে পড়ছে লম্বা সোফাটাতে। হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে যাচ্ছে, কিংবা খেতে বসেও উঠে যাচ্ছে মাঝখানে। নিশা কিছু জিজ্ঞেস করলে, উত্তরে শুধু হ্যাঁ কিংবা না।

দিনের পর দিন সে স্নান করে না, দাড়ি কামায় না, জিন্সের যে প্যান্ট-শার্ট পরে থাকে সারা দিন, তাই পরেই ঘুমোয়। সিগারেটের টুকরো জমে জমে অ্যাশট্রেটা পাহাড় হয়ে যায়।

তৃতীয় দিন আবার একটা দারুণ চমক পেল নিশা। ঘুম থেকে চক্ষু মেলেই। এত সকালেই স্নান করে নিয়েছে অরূপ, চুল ভিজে। পরিষ্কার দাড়ি কামানো। সব চেয়ে বড় কথা, সে পরে আছে ধপধপে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। যেন সম্পূর্ণ নতুন মানুষ।

নিজে দুকাপ চা বানিয়ে নিশাকে ডেকে তুলেছে।

বিছানায় উঠে বসে চায়ে চুমুক দিল নিশা। অরূপ একটু দূরে, চেয়ারে।

অরূপ শান্ত গলায় বলল, তোমাকে কয়েকটা কথা বলা দরকার নিশা। কদিন তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিনি, তাতে তুমি নিশ্চয়ই কষ্ট পেয়েছ। সেজন্য আমার মায়াও হচ্ছিল, অথচ মেজাজ ঠিক করতে পারছিলাম না। আমি এ-রকমই। একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আমার সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি, কথা হয়নি, তবু তুমি হুট করে এই দূর দেশে চলে এলে কোন সাহসে?

নিশা সরাসরি অরূপের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমিও এ- রকমই।

অরূপ বলল, বাঃ! তুমি এসেছ বলে আমি যে খুশি হইনি, তা নয়। কেন খুশি হব না? আমি তোমাকে ভালবেসে বিয়ে করেছি, কেউ তো জোর করে বিয়ে দেয়নি। সে-ভালবাসা চলেও যায়নি। আবার একথাও ঠিক, খানিকটা অস্বস্তিও বোধ করেছি। সংসার মানেই দায়িত্ব! দায়িত্ব নেবার অভ্যেস আমার চলে গেছে। যখন যা খুশি করি। এখন একটা দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে নেওয়া-।

নিশা বেশ জোর দিয়ে বলল, আমি তোমার বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। তুমি আমার পাসপোর্ট আর টিকিট উদ্ধার করার ব্যবস্থা করে দেবে? আমি ফিরে যাব।

অরূপ বলল, হ্যাঁ, সেগুলি উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে এবার। কিন্তু তুমি কেন ফিরে যাবে? আমি তো তোমাকে বোঝা বলিনি। দায়িত্বটাই বোঝা। সেটা যদি ভাগ করে নেওয়া যায়...। আসলে কি জানো নিশা, আমি নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারি না। এবার সামলে উঠতে হবে। আজ সকালে হঠাৎ মনে হল, এবার অন্য জীবন শুরু করা দরকার। তুমি আমাকে সাহায্য করবে?

নিশা বলল, আমি কী সাহায্য করব জানি না। তবে, তুমি যদি বলে দাও, সাধ্যমতো নিশ্চয়ই-

অরূপ বলল, তোমাকে একটা কথা বলা দরকার। আমার অনেক দিন চাকরি নেই, এলেবেলে চাকরি করতেও ইচ্ছে করে না, মন টেকে না। এর মধ্যে আমি এমন একটা

কাণ্ড করেছি, শুনলে তুমি শিউরে উঠবে। জীবন নিয়ে জুয়া খেলেছিলাম। তখন আমার হাতে একটাও পয়সা ছিল না। বাড়িভাড়া বাকি, চতুর্দিকে ধার। তখন লেসলি নামে একটা কালো ছেলে একটা বুদ্ধি দিল। ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে টাকা আদায় করা। তার একটা উপায়, বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া। আগে ফায়ার ইনসিওরেন্স করিয়ে তারপর ক্ষতিপূরণ চাওয়া। কিন্তু তাতে ঘরের মধ্যে কিছু অদ্ভুত দামি দামি জিনিস রাখতে হয়, আগুন ধরার আগে সেগুলো সরিয়ে নিলেই হল। কিন্তু দামি জিনিস রাখার সামর্থ্যও ছিল না, আগেই সব বিক্রি করে দিয়েছি। আর একটা উপায়, কোনও চলন্ত গাড়ির সামনে ঝাঁপিয়ে পড়া। এমন ভাবে পড়তে হবে, যাতে বিশেষ ক্ষতি না হয়। বড় রাস্তায় গাড়ি খুব স্পিডে ছোটে। কোনও গলি থেকে বড় রাস্তার মুখে, সকালে, যখন রাস্তায় অনেক লোক থাকে, কাছাকাছি পুলিশ আছে কিনা দেখে রাখতে হয়, ইনসিওরেন্স কোম্পানি ক্লেইম দিতে বাধ্য...আমার একটু ভুল হয়েছিল, টাইমিং-এর ভুল, তাই বাঁ-পায়ের ওপর একটা চাকা এসে পড়ল, সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, আমি বুঝি মরেই গেছি।

নিশা এমন ভাবে তাকিয়ে আছে, যেন সে ভূত দেখছে। ইচ্ছে করে কোনও শিক্ষিত মানুষ, শুধু টাকা রোজগারের জন্য চলন্ত গাড়ির সামনে লাফিয়ে পড়তে পারে?

অরূপ হাসতে হাসতে বলল, এটা জুয়া খেলা নয়? রাশিয়ান রুমেৎ নামে এক রকম জুয়া আছে, রিভলবারের মধ্যে একটা মাত্র গুলি ভরে, তারপর নিজের কপালে...অবশ্য ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে ভাল টাকা আদায় করতে গেলে মামলা লড়তে হয়। উকিলের খরচও অনেক। সে-টাকা পাব কোথায়? এ-দেশে এক রকমের উকিল থাকে, তাদের বলে ভালচার, শকুনি। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে তারা নিজেরাই উড়ে আসে। নিজেরাই মামলা লড়ে। ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করে, খরচ খরচা বাদ দিয়ে তার অর্ধেকটা উকিল নিয়ে নেয়। আমি বেশ ভাল টাকাই পেয়েছিলাম। এই হচ্ছে আমার পা ভাঙার রহস্য।

নিশা বলল, তুমি আমার ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দাও, প্লিজ!

অরূপ আরও জোরে হেসে উঠে বলল, ভয় পেও না। ও-রকম কাজ দ্বিতীয় বার করতে গেলে ধরা পড়ে যাব। জীবনটা বাজি রেখে একবারই জুয়া খেলা যায়। এবার একটা কিছু চাকরি করতেই হবে। পেয়ে যাব। কিন্তু তার আগে- ।

কয়েক মুহূর্ত সে স্থিরভাবে চেয়ে রইল নিশার দিকে। অনেকটা যেন আপন মনেই বলতে লাগল, তার আগে শ্লেটটা মুছে ফেলতে হবে। আই মাস্ট স্টার্ট উইথ আ ক্লিন শ্লেট। পারব কি? কেন পারব না!

আবার নিশাকে বলল, লিজ তোমাকে কী বলে গেছে আমি জানি। কিছুই অস্বীকার করছি না। এ-রকম কিছু কিছু কাণ্ড আমি করেছি। লোকে যা ইমমরাল বলে, সে-রকম অনেক কীর্তি করেছি নেশার ঝোঁকে। আমার লিবিডো প্রবল। সংযম-টংযম গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু এবার সত্যিই সেসব পুরনো ব্যাপার মুছে ফেলতে চাই। তোমাকে নিয়ে একটা সুস্থ, সুন্দর জীবন শুরু করতে চাই। আগে যা যা করেছি, তার জন্য কি তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে? স্বামী হিসেবে নতুন করে মেনে নিতে পারবে আমাকে?

নিশা হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে দিল।

অরূপ অস্থিরভাবে বলল, নিশা, চুপ করে থেকো না, বলো, বলো, আমি সব কিছুর জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

নিশা কান্না সামলাতে পারছে না, কথা বলতে পারছে না।

এরপর সারাদিনটা যেন নিশার জীবনে সব চেয়ে মধুর দিন। অরূপ বাইরে বেরুল না। সে নিজে নতুন নতুন রান্না করে খাওয়াল নিশাকে। বিয়ার পান করলনা, গাঁজা টানল না, শুধু মুখোমুখি বসে অনেক গল্প।

এক সময় অরূপ বলল, তুমি এত দিন এসেছ, তোমাকে তো কিছুই দেখানো হয়নি। এই শহরে এসে সবাই আগে নায়েগ্রা ফলস দেখতে যায়। একটা ব্রিজ পেরিয়ে, ও-পারে ক্যানাডার দিক থেকে দেখা যায় খুব ভাল করে। চলো, কালই নিয়ে যাব তোমাকে।

একটু ভেবে সে আবার বলল, আরও কয়েক জনকে নিয়ে বেশ একটা পিকনিক করলে হয়। দাঁড়াও, রফিককে জিজ্ঞেস করি।

ফোনে কথা হল রফিকের সঙ্গে। রফিক রাজি, কিন্তু কালই যেতে পারবে না, তিন দিন পরেই শনিবার, সেই দিনই তার সুবিধে।

অরূপ তাতেই রাজি। রফিকের গাড়িটা বড়, যাওয়া হবে সেই গাড়িতে।

পরবর্তী দু'দিন বেশ ব্যস্ত রইল অরূপ। নানা জায়গায় চাকরির সন্ধান করছে। সন্ধের সময় সে অনেকরকম কেক-পেস্ট্রি কিনে আনে। নেশা করে না। গান শোনে। সত্যিই সে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে।

শনিবার বেলা এগারোটায় বেরিয়ে পড়ার কথা। তার আগে অরূপ বলল, তাকে এক জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে যেতে হবে। ফিরে আসবে ঠিক এগারোটার মধ্যে। বড় জোর পাঁচ-দশ মিনিট দেরি হতে পারে।

স্নান-টান সেরে তৈরি হয়ে নিল নিশা। আজ সে বেশ সাজগোজ করল। এই প্রথম তার বেড়াতে যাওয়া।

এর মধ্যে রেহানার সঙ্গেও কথা হয়েছে, সে-ও যাবে। এখানকার পাট চুকিয়ে রেহানা চলে যাচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ায় আর চার দিন পরে। সেখানে সে তার স্বামীর কাছাকাছি থাকবে।

এগারোটার একটু আগেই পৌঁছে গেল রেহানা। রফিকও ওপরে এসে তাড়া দিল, সব রেডি তো? একটা বাস্কেট নানা রকম খাবার-দাবার, বিয়ার, কোল্ড ড্রিংকস গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন শুধু অরূপের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা।

সাড়ে এগারোটা, বারোটা বেজে গেল, অরূপের পাত্তা নেই।

ওরা তিন জন গল্পে মেতে আছে বটে, মাঝে মাঝেই ঘড়ি দেখছে অস্থির ভাবে। সাড়ে বারোটা, একটা, দেড়টা...।

টেলিফোন বেজে উঠল। নিশা ধরার পর অরূপ বলল, ছি ছি, কী লজ্জার কথা, তোমরা নিশ্চয়ই তৈরি হয়ে বসে আছ, আমি বিশ্রীভাবে আটকে গেছি। এখানকার জেনারাল ম্যানেজার আমাকে বসিয়ে রেখেছে, কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমাকে কথা বলিয়ে দিতে চায় আজই। তোমরা বেরিয়ে পড়ো, ফোনটা রফিককে দাও।

রফিক বলল, তুমি আসতে পারছ না? তাহলে আজ থাক।

অরূপ বলল, না না, শুধু শুধু তোমরা দিনটা নষ্ট করবে কেন? তোমরা চলে যাও। আমি যদি আর কিছুক্ষণের মধ্যে ছাড়া পাই, আমি ওখানে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে জয়েন করব। তুমি গাড়িটা পার্ক করবে কোথায়? আমি খুঁজে নেব। আর দেরি কোরো না, মেঘলা হয়ে গেলে রামধনুটা দেখতে পাবে না। নিশাকে ভাল করে ঘুরিয়ে দেখিও। নিশার ভার তোমার ওপর।

ফোন ছেড়ে দিয়ে রফিক বলল, অরূপের কি শরীরটা খারাপ? গলার আওয়াজ ভাঙা ভাঙা শোনাল।

নিশা বলল, আমারও কেমন যেন লাগল। সকালবেলা তো ঠিকই ছিল।

একটু মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল নিশার। কিন্তু বেড়াতে গিয়ে সে অপূর্ব আনন্দ পেল। নায়েগ্রা জলপ্রপাতের বিষয়ে সে জানত, ছবিতেও দেখেছে, কিন্তু নিজের চোখে দেখার

অভিজ্ঞতাই অন্য রকম। এত বিশাল! এমন স্পষ্ট, স্থায়ী রামধনুও সে আগে কখনও দেখেনি।

এই শহরে যারা থাকে, তাদের বার বার নায়েগ্রা দেখতে হয়, অতিথিদের জন্য। রেহানা দেখেছে তিনবার, রফিক দেখেছে সতেরো বার। ওদের আর তেমন আগ্রহ থাকার কথা নয়। কিন্তু ওরা, বিশেষ করে রফিক এমন যত্ন নিয়ে সব কিছু দেখাতে লাগল নিশাকে, যেন সে-ও প্রথম বার দেখছে।

একেবারে নিচে বোটে চড়তে গিয়ে বেশ ভয় পাচ্ছিল নিশা, রফিক তার হাত ধরে রইল। রেহানা অবশ্য ভয় পায় না, সে সব কিছুতেই হাসে। বাড়ি ফিরে এল রাত সাড়ে নটায়।

অরূপ তখনও ফেরেনি। অরূপকে সব গল্প শোনাবার জন্য ছটফট করছে নিশা। খিদে নেই, তবু সে জেগে বসে রইল।

সে-রাতেই আর ফিরল না অরূপ। পরদিনও না। পাঁচ দিন কেটে গেল, অরূপের কোনও সাড়াশব্দ নেই। যেন মানুষটা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

টেলিফোন বাজলেই নিশা ছুটে যায়। অন্য নারী বা পুরুষ। তারা অরূপের খোঁজ করে। রফিক প্রত্যেক দিনই একবার করে আসে। অরূপ ফেরেনি শুনে মুখ কালো করে চলে যায়। ষষ্ঠ দিনে রফিক একগাদা মাছ-তরকারি বাজার করে নিয়ে এল।

সে বলল, ভাবী, আমি লক্ষ্য করেছি, আপনি এর মধ্যে একবারও বাড়ি থেকে বেরোননি। টেলিফোনের জন্য অপেক্ষা করেন, তাই না?

নিশা বলল, তা বলে আপনি এত জিনিস কিনে আনবেন? আমি একা একা কত খাব?

রফিক বলল, আমাকেও তো নিজে রান্না করে খেতে হয়। কখনও আপনি রাঁধবেন, আমরা দু'জনে খেতে পারি।

নিশা বলল, তাহলে আজই আপনি এখানে খেয়ে যান।

চেয়ারে বসে রফিক বলল, ভাবী, ব্যাপারটা যদিও খুব অস্বস্তিকর, তবু আপনার জানা দরকার। আপনার স্বামী গায়ক মানুষ, স্বভাবটা খুবই বাউণ্ডুলে হয়ে গেছে। এখানকার যে-সব ছেলে-মেয়ে খুব নেশা-ফেশা করে, তাদের সঙ্গে খুব ভাব। আমি অনেক বার ঠারেঠোরে নিষেধ করেছি। এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কি আমরা পারি? লিজি নামে একটা মেয়ে আছে, এখানে অনেকেই চেনে, এ বাড়িতে বেশ কয়েক বার আসতে দেখেছি। মাঝে মাঝেই সে উধাও হয়ে যায় কোনও ছেলের সঙ্গে। সে-ই হয়তো ভুলিয়ে ভালিয়ে অরূপকে কোথাও নিয়ে গেছে।

লিজির নাম শুনে নিশার মুখখানা কয়েক মুহূর্তের জন্য কঠিন হয়ে গেল। মেয়েটা একদিন এসে কত বড় বড় কথা শুনিয়ে গেল। সে নাকি মিথ্যে কথাকে ঘৃণা করে। তার পুরোটাই মিথ্যে! এ-দেশের মেয়েরা এমনই হয়?

মুখ তুলে সে বলল, অরূপ কি ছেলেমানুষ যে-তাকে কেউ ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যাবে? একটা খবর পর্যন্ত দিল না!

রফিক বলল, এমনিতে মানুষটা ভাল, মাঝে মাঝে কী যে পাগলামি চাপে মাথায়।

আপনি আমার একটা উপকার করবেন? আমার পাসপোর্ট, টিকিট হারিয়ে গেছে, সেগুলোর ডুপ্লিকেট জোগাড় করার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন?

হারিয়ে গেছে?

হ্যাঁ, বোস্টনে, চুরি গেছে! থানায় ডায়েরি করা আছে, সে প্রমাণও আছে আমার কাছে।

টিকিটের আগে, আপনার পাসপোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে। সেটাই আপনার আইডেনটিটি। এখানে হবে না, নিউ ইয়র্ক থেকে... আপনার ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট, ওখানে তো আমার কেউ চেনা নেই, দেখি খোঁজখবর নিয়ে।

দেখুন প্লিজ, আমি বুঝে গেছি, এ-দেশে আমার থাকা হবে না।

অত চিন্তা করবেন না। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই!

কী রান্না করব, আপনি কী ভালবাসেন বলুন!

ছোট বাঁধাকপি এনেছি, তার সঙ্গে চিংড়ি মাছ দিয়ে কেমন হয়?

ভালই হবে। চিংড়ি মাছকে আপনারা ইচা মাছ বলেন না বাংলাদেশে?

অনেকে বলে। আপনি জানলেন কী করে?

আমার মা-বাবা সবাই তো বাঙাল!

দিনের পর দিন কেটে যায়, অরূপের কোনও সাড়াশব্দ নেই। কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে? আবার কি সে জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে গেছে? গাড়িটা নিয়ে গেছে, সঙ্গে ক্রেডিট কার্ড আছে, দুর্ঘটনায় পড়লে পুলিশ ঠিক পরিচয় বার করে ফেলে। টিভি-তে সেই রকম কত ঘটনা দেখায়।

প্রত্যেক দিন রফিক একবার খোঁজ নিয়ে যায়। তার আচরণ অত্যন্ত ভদ্র। দুজনে এক সঙ্গে বসে খায় প্রায়ই কিন্ত রফিক কক্ষনও কোনও অসভ্যতা তো দূরে থাক, হাতটাও ধরেনি।

রেহানা এখানে নেই, আর কার সঙ্গেই-বা কথা বলবে নিশা।

কয়েকবার অবনীর কথা ভেবেছে। কিন্তু অবনী তো নিজে থেকে একবারও তার খোঁজ করেনা। অবনীর কাছে তার ধার আছে শুনে অরূপ তক্ষুনি সে টাকাটা পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সেই সময় অবনীর সঙ্গে ফোনে তার কথা হয়েছে। অবনী এখানকার ফোন নাম্বার জানে। সে যেন নিশার সঙ্গে কোনও রকম ব্যক্তিগত সম্পর্ক চায় না।

একবার অবনী যথেষ্ট সাহায্য করেছে, আবার বিপদে পড়ে সে অবনীর কাছে সাহায্য চাইবে কেন? না, কোনও দরকার নেই।

নিছক কৌতূহলে সে একবার ফোন করল লিজকে। সে বাড়ি নেই, চারবার রিং হবার পরেই চালু হয়ে গেল আনসারিং মেশিন। দূর ছাই বলে রেখে দিল নিশা।

শুধু ওই দূর ছাইটুকু শুনেই রাত্তিরে ফোন করল লিজ। কিন্তু এখন আর নিশার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

সে বলল, ফোন করেছিলাম বলে দুঃখিত। আমার কিছু বলার নেই।

লিজ বলল, এক সেকেন্ড। তুমি কি আমার সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা করেছ?

আমার আর কিছু যায় আসে না।

শোনো, আমি আজই জানতে পারলাম যে, অরূপ শহরে নেই। তোমার সঙ্গে কথা হবার পর আর একবারও অরূপের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমি আমার বাড়িতে তাকে আসতে বারণ করে দিয়েছি। তবে আমাদের কয়েক জন কমন বন্ধু আছে, তাদের কাছ থেকে নানা রকম খবর পাই। অরূপ তোমাকে না জানিয়ে কোথাও চলে গেছে?

সে বেঁচে আছে কি না আমি তা-ও জানি না।

মার্থা নামে আমাদের বান্ধবীকেও কয়েক দিন দেখছি না। তার গাড়ি রয়েছে বাড়ির সামনে, সে নেই। অরূপ কি গাড়ি নিয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

তাহলে মার্থার সঙ্গেই কোথাও গেছে মনে হয়। বাল্টিমোরে একটা মিউজিক ফেস্টিভাল হচ্ছে।

থাক, আমি আর শুনতে চাই না।

সত্যিই এই ধরনের কথা আর শুনতে ইচ্ছে করে না নিশার।

এর মধ্যে সে এক দিনও আর কাঁদেনি। বরং সব সময় যেন রাগে ফুঁসছে। অনেকটা নিজেরই ওপর রাগ। কেন নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই তার?

সেই রাগটা পরদিন অকারণে রফিকের ওপরই প্রকাশ করে ফেলল।

ইলিশ মাছ জোগাড় করে এনেছে রফিক। টাটকা। নিশা দরজা খোলার পরই সে উল্লাসের সঙ্গে বলে উঠল, বৃষ্টি আসছে, আজ খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা।

রাগে গনগনে মুখ করে নিশা বলে উঠল, কেন রোজ রোজ এ-সব নিয়ে আসেন আপনি? আমি কি আপনার রাঁধুনি? আমার ওপর করুণা করছেন? আমি করুণা সহ্য করতে পারি না। আমি নিজেই নিজের ব্যবস্থা করতে পারব। ফেরত নিয়ে যান ওটা। এ পর্যন্ত কত খরচ করেছেন আমার জন্য, বলে দেবেন, আমি মিটিয়ে দেব।

মুখটা চুপসে গেল রফিকের। তবু সে মিন মিন করে বলল, আপনাকে রান্না করতে হবে না। আমি রাঁধলে আপনি খাবেন আজ?

গলা চড়িয়ে নিশা বলল, না, আমি কিছু খাব না। আমি খাই বা না খাই, তাতে আপনার কী যায় আসে?

রফিক বলল, আপনার আজ খুবই মেজাজ খারাপ দেখছি। তাহলে ইলিশ থাক ডিপ ফ্রিজে। পরদিন সকালে আর রফিক এল না, নিশাও তাকে ডাকতে গেল না। কেন সে বার বার অন্যের অনুগ্রহের ভিখারি হবে? দুপুরবেলা ফোনটা হঠাৎ অচল হয়ে গেল।

রফিক এক দিন ইঙ্গিত দিয়েছিল, এখানে ফোনের বিল এক মাসের বেশি বাকি রাখলেই লাইন কেটে দেয়। এই ভাবে রান্নার গ্যাসও বন্ধ হয়ে যায়।

এই অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া কত দিন বাকি আছে কে জানে! এখানে মামলা-টামলার দিকে কেউ বড় একটা যায় না। ভাড়া দাওনি, গেট আউট। যে-কোনও দিন বাড়িওয়ালা এসে নিশাকে এখান থেকে বার করে দিতে পারে।

পাসপোর্টের ডুপ্লিকেট করার জন্য নিশাকে নিউইয়র্কে যেতে হবে। কে তাকে নিয়ে যাবে, কোথায় উঠবে, ভাড়ার টাকাই-বা কোথায় পাবে? এর মধ্যে আবার একমাত্র বন্ধু রফিককে মনে দুঃখ দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

ক্রেডিট কার্ডের যুগ, বাড়িতে ক্যাশ টাকা বিশেষ কেউ রাখে না। শুধু খুচরো পয়সা অনেক জমে যায়। একটা কাচের বোলের মধ্যে রাখা ডাইম আর কোয়ার্টারগুলো গুনে দেখল নিশা, মোট বিয়াল্লিশ ডলার, চল্লিশ সেন্ট। এই তার সম্বল।

অরূপ তার নামে একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দেবে বলেছিল, দেওয়া হয়নি। ফ্রিজ খালি, ওই খুচরো পয়সা দিয়ে এখনও রুটি-মাখন-ডিম কিনে আনা যায়, তবু বেরুল না নিশা। না খেয়ে থাকবে। কত মানুষই তো এক দিন-দু'দিন খায় না। এখনও চা-চিনি আছে।

চার দিন হয়ে গেল, রফিক আর খোঁজ নিতে আসেনি।

খুব অভিমান হয়েছে! রফিক তার ওপর জোর করে না কেন? নিশা যখন ধমকাচ্ছিল, উলটে সে-ও কেন ধমক দেয়নি? রফিক কি বুঝতে পারে না, কেন নিশার মেজাজ খারাপ হয়? তাহলে আর কীসের বন্ধুত্ব! ইলিশ মাছটা কি সে নিজে রান্না করে খেয়ে ফেলেছে এর মধ্যে?

কিংবা রফিকও অন্য কোথাও চলে গেল নাকি?

নিশা রফিকের খোঁজ নিতে যাচ্ছে না বটে, কিন্তু সর্বক্ষণ মনে মনে রফিকের সঙ্গেই যেন কথা বলছে।

অরূপের ফেলে যাওয়া কিছু সিগারেট রয়ে গেছে। কোনও দিন খায় না, তবু আজ একটা সিগারেট ধরালো নিশা। না, এর মধ্যে গাঁজা-টাজা নেই। অনবরত কাশছে, তা-ও ফেলবে না। গান বাজাতে লাগল খুব জোরে জোরে। সারা দিন যে কিছু খায়নি, সেজন্য বেশ একটা অহঙ্কার বোধ করছে। পয়সা একেবারে ফুরোয়ানি, রফিকের কাছেও কিছু চাইবে না, সে ইচ্ছে করেই না খেয়ে থাকতে পারে।

দিনের পর দিন না খেয়ে সে এই ঘরেই মরে পড়ে থাকবে। তাতে কার কী আসে যায়? এ-দেশে অনেক নিঃসঙ্গ বুড়ো-বুড়ির এই দশা হয়, দুর্গন্ধ পেয়ে দরজা ভেঙে বার করা হয় তাদের মৃতদেহ। নিশার বয়েস এখন একত্রিশ বছর চার মাস।

পরদিন সকালে মত বদলে ফেলল নিশা।

সে কেন সম্পূর্ণ হার মানবে? সে কি নিজের চেষ্টায় বাঁচতে পারবে না? কোনও ক্রমে যদি একটা কাজ জোগাড় করা যায়, যাতে ঘরভাড়াটা অন্তত, আর খাওয়ার খরচ তো সামান্য।

অনেক দোকানের বাইরে নিশা ‘হেলপ ওয়ান্টেড’ এই বোর্ড ঝোলানো দেখেছে। ওগুলো অস্থায়ী চাকরি। এক মাস, দুমাসের জন্য রাখে। আপাতত সেই রকমই একটা পেলে হয়। সে রেস্তোরাঁয় কাশ-ডিশ ধুতে পারবে, টেবিল মোছার কাজ নিতেও আপত্তি নেই। এ-দেশে অনেক ভাল ভাল ঘরের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ার খরচ জোগাবার জন্য ওই চাকরি নেয়। কোনও কাজই অসম্মানের নয়।

মন দিয়ে সাজগোজ করল নিশা। প্যান্ট-শার্ট পরল, ভুরু আঁকল, লিপস্টিক দিল ঠোঁটে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল নিজেকে। বাইরেটা দেখে কেউ কি বুঝতে পারবে যে, তার বুকটা একেবারে খালি?

দরজা বন্ধ করে নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। অনেক দিন পর।

দো-তলায় রফিকের ঘরের দরজা বন্ধ। বেরিয়ে গেছে, না ঘরেই আছে? সপ্তাহে কবে কবে যেন সে বেলা করে বেরোয়?

বাচ্চা মেয়ের মতো পা টিপে টিপে সে রফিকের দরজায় কান পেতে রইল। কার গলার আওয়াজ? ওঃ, টিভি চলছে, তার মানে রফিক ঘরেই আছে। ডাকল না নিশা।

প্রথমে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দ্বিধা করতে লাগল। কী করে কথাটা বলতে হয়? প্রথম বাক্যটা কী হবে? আমি তোমার কাছে চাকরি চাইতে এসেছি? কিংবা আই অফার মাই সারভিস টু ইউ? কিংবা কিছু কি লিখে আনতে হয়?

এসে যখন পড়েছে, চেষ্টা করে দেখতেই হবে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে সে কাউন্টারের কাছে দাঁড়াল। এক জন মোটাসোটা লোক সেখানে বসে আছে।

নিশা বাইরে ঝোলানো 'হেল্প ওয়ান্টেড' বোর্ডটার দিকে আঙুল দেখিয়ে কিছু বলার আগেই লোকটি বলল, আহ-হা, তুমি দেরি করে এলে? একটু আগেই এক জন কথা বলে গেছে, বোর্ডটা খোলা হয়নি। তোমার মতো এক জন ফাইন, ইয়াং লেডিকে পেলে আমি খুবই লাভবান হতাম। তুমি সামনের মাসে আবার খোঁজ নিও। অবশ্যই এসো।

এর পরের দুটি দোকনেও কাজ পাওয়া গেল না, এবং প্রথমটির মতো ভাল ব্যবহারও পেল না। দু'জায়গাতেই গম্ভীর ভাবে উত্তর পেল, দুঃখিত, আমরা পুরুষ খুঁজছি।

চতুর্থ জায়গাটিতে একটি সাংঘাতিক কাণ্ড হল।

কাউন্টারের লোকটির চওড়া ধরনের মুখ, চেহারাটি প্রায় দৈত্যের মতো। রেস্তোরাঁ চালাবার বদলে কুস্তিগির হলেই যেন তাকে মানাত।

নিশার দু'একটা কথা শোনার পরই সে বলল, পাসপোর্ট দেখি!

নিশা ইতস্তত করে বলল, পাসপোর্ট আমার সঙ্গে নেই।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, পাকিস্তানি?

নিশা বলল, না, ভারতীয়।

লোকটি এবার ঠোঁট উলটে বলল, ওই একই হল। ইললিগাল ইমিগ্রান্ট। এরা দেশটা ছেয়ে ফেলল।

নিশা পেছন ফিরে চলে যাবার উদ্যোগ করতেই লোকটি চেঁচিয়ে বলল, দাঁড়াও! আইমাস্ট ইনফর্ম দা পুলিশ! ততক্ষণ তুমি যেতে পারবে না।

পাশের টেবিল থেকে এক জন খদ্দের বলল, হেই, তুমি কোনও মহিলাকে জোর করে আটকে রাখতে পারো না।

মালিকটি বলল, ওকে ছেড়ে দিলে ও ভিড়ে মিশে যাবে। আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুলিশকে খবর দেওয়া আমাদের নাগরিক কর্তব্য।

খদ্দেরটি বলল, খুঁজে বার করা পুলিশের দায়িত্ব। যতক্ষণ না কিছু প্রমাণ হয়, ততক্ষণ কারুকে ধরে রাখার অধিকার তোমার নেই।

অন্য দু'এক জন খরিদ্দার উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সমর্থন করল। আবার কয়েক জন মালিকের পক্ষে গিয়ে বলল, ও ঠিকই বলেছে, এই ইললিগাল ইমিগ্রান্টরা হাজার রকম সমস্যা তৈরি করছে। পুলিশের হাতেই ওকে তুলে দেওয়া উচিত।

শুরু হয়ে গেল দু'পক্ষের তর্কাতর্কি। পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে আছে নিশা।

মালিকটা কাউন্টার ছেড়ে নিশার পাশে চলে এসে অসম্ভব আত্মম্ভরিতার সঙ্গে বলল, যে-যাই বলুক, আমি ওকে ছাড়ছিনা। পাসপোর্ট দেখতে চাইলেই এরা পালায়। অল দিজ ডার্টি ওরিয়েন্টালস।

ভিড় ঠেলে সামনে চলে এল রফিক। শান্ত গলায় বলল, খবর্দার, ওর হাত ধরবে না।

মালিকটি চোখ দুটি হিংস্র করে বলল, তুমি আবার কে?

রফিক বলল, এই মহিলা আমার স্ত্রী।

তারপর তেজের সঙ্গে বলল, তুমি কী করে জানলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী? আমি আমেরিকার নাগরিক। তোমারই মতো আমার সমান গণতান্ত্রিক অধিকার। আমার স্ত্রীরও একই অধিকার।

মালিকটি বলল, দেখি তোমার পাসপোর্ট।

রফিক বলল, তুমি কি সব সময় পাসপোর্ট নিয়ে ঘোরো? তাছাড়া আমার পাসপোর্ট তোমাকে দেখাতে বাধ্য নই। এই আমার কার্ড। অফিস, বাড়ি দু'জায়গায়ই ফোন নাম্বার আছে। তুমি যত ইচ্ছে পুলিশকে খবর দিতে পারো।

মালিকটি এবার খানিকটা চুপসে গিয়ে বলল, তোমার স্ত্রী পাসপোর্ট আনেনি কেন? চাকরি চাইতে গেলে পাসপোর্ট দেখাতে হয় জানো না?

রফিক বলল, ওর পাসপোট চুরি গেছে। কোনও একজন ডার্টি, হোয়াইট শিট, সান অপ আ বীচ ওর হ্যান্ডব্যাগ চুরি করেছে। পুলিশে খবর দেওয়া আছে।

তারপর বাংলায় সে নিশাকে বলল, ভাবী, চলে আসুন আমার সঙ্গে। ভিড় দু'ফাঁক হয়ে গেল। নিশার হাত ধরে, মাথা উঁচু করে বেরিয়ে এল রফিক। কিছুক্ষণ ওরা হাঁটল নিঃশব্দে।

একটু পরে রফিক ক্ষমাপ্রার্থীর মতো সঙ্কুচিত ভাবে বলল, ভাবী, আমাকে ওই কথাটা বলতে হল বাধ্য হয়ে। কিছু মনে করবেন না।

নিশা বলল না কিছুই।

রফিক আবার বলল, আপনার হাত ধরেছি, সেজন্য মাপ করবেন।

নিশা মুখ নিচু করে রাস্তা দেখছে।

রফিক বলল, আপনি চাকরি করতে চান .. আমাকে বললে, কোনও ইন্ডিয়ান বা বাংলাদেশি দোকানে ব্যবস্থা করা যেত, ওরা বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস করেনা, বেতন অবশ্য কম দেয়।

এবারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নিশা জিজ্ঞেস কবল, আপনি ঠিক এই সময়েই এই দোকানে হাজির হলেন কী করে?

লাজুক ভাবে হেসে রফিক বলল, কাকতালীয় হতে পারে।

নিশা বলল, হতে পারে নয়, কী হয়েছে জানতে চাই।

রফিক বলল, আজ আপনি বেরোলেন অনেকদিন পর, আমার দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, টের পেয়েছি। তারপর ইচ্ছে হল, আপনার পিছু পিছু ঘুরছিলাম। প্রত্যেকটা দোকানেই দূর থেকে দেখেছি। ও-রকম গোলমাল না হলে আমি সামনে আসতাম না।

রফিকের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে নিশা বলল, আজ থেকে আমাকে আর ভাবী বলে ডাকবে না। আমার নাম নিশা। সেটাই আমার পরিচয়। আজ থেকে আমি আর অরূপের স্ত্রী নই। স্বামীরা স্ত্রীকে ত্যাগ করে পালাতে পারে, স্ত্রীরা কেন তা পারব না? আমার জীবন থেকে আমি অরূপের নাম মুছে দিলাম।

সে নিজে হাত বাড়িয়ে রফিকের একটা হাত ধরল।

রফিক বলল, বৃষ্টি এসে গেল, আসুন দৌড়ই।

ছুটতে লাগল দুজনে।

ছুটতে ছুটতেই রফিক বলল, ইলিশটা এখনও ডিপ ফ্রিজে রাখা আছে। আজ খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা হবে?

নিশা বলল, হবে।

.

০৭.

দরজার বেল শুনে খুলে দিল রফিক। ও-পাশের মানুষটিকে দেখে সে প্রথমে কথাই বলতে পারল না।

সারা সন্ধে বৃষ্টি হচ্ছে। সেই লম্বা মানুষটির গায়ে একটা রেনকোট। চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দুটো লাল, দেখে মনে হয়, সারা দিন নেশা করেছে।

মিষ্টি হেসে অরূপ বলল, আসসালামু আলাইকুম, কী রফিক মিঞা, চিনতে পারছ না নাকি? মরিনি। জলজ্যান্ত ফিরে এসেছি। তারপর খবরটবর কী?

শুকনো ভাবে রফিক বলল, ভাল।

অরূপ বলল, ওপরে আমার ফ্ল্যাটটা বেদখল হয়ে গেছে দেখলাম।

রফিক বলল, ভাড়া বাকি থাকলে কি মালিক ফেলে রাখে?

আমার মালপত্তর?

নিচে বেসমেন্টে রাখা আছে।

আর আমার বেটার হাফটি কোথায় বলতে পারো? তাকে তো আর বেসমেন্টে ডাম্প করা যায় না!

আপনি এত দিন পরে তার খবর নিচ্ছেন?

মতিভ্রম মতিভ্রম বুঝলে ভাই, মুনি-ঋষিদেরও মতিভ্রম হয়। পাগল হইয়া বনে বনে ঘুরি আপন গন্ধে মম..হা-হা-হা-হা। তা সে গেল কোথায়? দেশে ফিরে গেছে? দা বয় স্টুড অন দা বার্নিং ডেক এর মতো সে ভাঙা সংসারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে না জানি, কিন্তু কোথাও তো থাকবে। এ কী রফিক, তুমি দরজা আটকে দাঁড়িয়ে রইলে, আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না? তোমার মতো এত ভদ্র মানুষ... বদলে গেলে নাকি?

আসুন।

ভেতরে এসে, চারদিক তাকিয়ে, নাক দিয়ে ফুঁ ফুঁ করে সে বলল, মেয়েলি গন্ধ পাচ্ছি। এর মধ্যে বিয়ে করে ফেলেছ নাকি?

রফিক বলল, না।

ভুরু নাচিয়ে অরূপ জিজ্ঞেস করল, তাহলে লিভিং টুগেদার?

রফিক বলল, কথাটার যেমন মানে হয়, সে-অর্থে নয়!

সোফায় বসে পড়েও আবার লাফিয়ে উঠে অরূপ বলল, নিশা, নিশা! আমার ধর্মপত্নী! গন্ধটা ঠিক চিনেছি। আমার নাকটা কত চোখা দেখেছ? নিশা এখানে আছে, তাইনা?

রফিক ঘাড় হেলাল।

অরূপ ছুটে এসে রফিকের কাঁধ চাপড়ে বলল, গ্রেট, গ্রেট! তুমি বিপদের সময় নিশাকে আশ্রয় দিয়েছ। উপকারী রফিক! অসময়ের বন্ধুই তো আসল বন্ধু। তোমাকে কত যে ধন্যবাদ দেব। তুমিই তোমার তুলনা। নিশা কি এখন আছে? একবার ডাকো।

একটু ইতস্তত করে রফিক ভেতরে চলে গেল।

তার অ্যাপার্টমেন্টটা বড়। বসবার ঘর ছাড়াও একটা শয়নকক্ষ, রান্নাঘরেও অনেকটা জায়গা। সেই রান্নাঘরের জানলার কাছে পাথরের মর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে নিশা।

রফিক বলল, কে এসেছে, বুঝতে পেরেছ?

নিশা চুপ করে রইল।

রফিক বলল, তোমাকে ডাকছেন।

নিশা মুখ না ফিরিয়েই বলল, বলে দাও, দেখা হবে না।

রফিক বলল, যদি কিছু বলতে চান।

নিশা বলল, আমি শুনতে চাই না। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, আমি ওর মুখও দেখতে চাই না, কিছুতেই না।

রফিক বসবার ঘরে ফিরে এসে বলল, দাদা, উনি এখন দেখা করতে চাইছেন না আপনার সঙ্গে।

অরূপ বলল, রাগ করে আছে? তা তো হতেই পারে। আমার মতো একটা পাষণ্ডের ওপর রাগ করবে না? রফিক, তুমি আমার সঙ্গে আপনি আজ্ঞে করে কথা বলছ কেন? আমাদের তুমি-তুমি'র সম্পর্ক ছিল।

অনেক দিনের কথা। ভুলে গেছি।

ঠিক চার মাস। গলা শুকিয়ে গেছে, তোমার কাছে বিয়ার-টিয়ার নেই?

না। চা খাবেন?

চা? সন্ধের পর চা খেলে শরীর খারাপ হয়। ওঃ হ, আমার কাছেই তো খানিকটা আছে।

রেনকোটের পকেট চাপড়ে সে একটা স্কচের পাঁইট বার করল। খানিকটা গলায় ঢেলে দিয়ে বলল, একটু বসি। খানিক বাদে রাগ কমলে ডেকে দিও।

রফিক বলল, উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান না স্পষ্ট বলে দিয়েছেন।

তুমিই তো বললে, তোমাদের বিয়ে হয়নি। হবেই-বা কী করে! আমার সঙ্গে তো ডিভোর্স হয়নি। তার মানে, নিশা এখন আমার আইনসঙ্গত স্ত্রী। ওর সঙ্গে দেখা করার আমার রাইট আছে।

উনি যদি না চায়...।

আমি ভেতরে যাব।

সেটা সম্ভব নয়।

আমি যেতে চাইলে তুমি কী করবে?

বাধা দেব। আপনি জানেন, আপনার থেকে আমার গায়ের শক্তি বেশিই হবে। কিন্তু আমি বলপ্রয়োগ একেবারে পছন্দ করি না।

চোপশালা! আমাকে গায়ের জোর দেখাচ্ছিস? আইন আছে না, পুলিশ আছে না? আমার বিয়ে করা মাগী, আমি চুল ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাব।

হুইস্কিতে আর একটা চুমুক দিল অরূপ।

কঠিন মুখে রফিক বলল, আপনি আইন দেখাচ্ছেন, পুলিশ দেখাচ্ছেন! ও-সব বাইরে গিয়ে যা ইচ্ছে করুন। আমার এখানে ও-রকম কোনও কথা শুনতে চাই না। প্লিজ গো।

না, যাব না! আমার বউকে তুই লুকিয়ে রেখেছিস শালা। দেখা করতে দিবি না কেন রে?

আমি মোটেই লুকিয়ে রাখিনি। তিনি এখানে আছেন, তা আমি অস্বীকার করিনি। তিনি দেখা করতে চাইলে আমার কোনওই আপত্তি নেই। কিন্তু আপনাকে আমি জোর ফলাতে দেবনা!

নিশা। নিশা!

প্লিজ, ও-রকম চিৎকার করবেন না। আপনি নিজের মান-সম্মান নষ্ট করছেন।

আমার মান-সম্মান বলে কিছু নেই। আমি শালা পাগলা দিগম্বর। বোম ভোলা! নিশা, নিশা, একবারটি এখানে এসো। লক্ষ্মীটি।

ও-রকম ভাবে চেঁচিয়ে কোনও লাভ নেই।

আমাকে ভয় দেখাচ্ছ, রফিক। নিশাকে তোমার বিয়ে করার মতলব?

আমার কোনওই মতলব নেই।

লিভিং টুগেদার কত দিন চালাবে? তোমাদের বাংলাদেশিরাই বয়কট করবে তোমাকে। বিয়ে করতে পারবে না। আমি ডির্ভোস দিলে তো! দেবনা, কিছুতেই দেব না। তোমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাব।

এ-সব অবান্তর কথা আমি শুনতে চাই না।

তোমাকে গালাগালি দিয়েছি বলে আমি দুঃখিত। হঠাৎ হঠাৎ মাথা গরম হয়ে যায়। ওটাই তো আমার রোগ। মাপ করে দাও! এবার ঠাণ্ডা মাথায় বলছি, নিশা এত দিন তোমার সঙ্গে ছিল, আই ডোন মাইন্ড, আমিও তো... ওতে কিছু আসে যায় না। জানো তো, অমৃত কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না? এখন নিশাকে আমি ফেরত চাই। আমি আবার সংসার পাতব। চাকরি পেয়েছি, আর কোনও প্রবলেম নেই। এবার থেকে সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এই কথাগুলো বলতে দাও আমাকে।

উনি আসতে চাইছেন না, তা আমি কী করব?

কোন ঘরে আছে?

যে-ঘরেই থাক, আপনার জোর করে যাওয়া চলবে না!

তাহলে এখান থেকেই বলি? নিশা, ফিরে এসো! তুমি আমার বউ! নিজের অধিকারে, নিজের সংসারে থাকবে। পুরনো সব কিছু মুছে ফেলব। ট্রাস্ট মি! নতুন ভাবে জীবন শুরু হবে। আই ওয়ান্ট আ চাইল্ড! নিশা, ফিরে এসো! সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার। তোমার জন্য বুকটা টন টন করে। মাইরি বলছি! অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে তোমার তুলনাই হয় না!

নিশা ঠায় একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে জানলার দিকে মুখ করে। এবার সে দু'হাতে কান চাপা দিল।

আর এক চুমুকে বোতলটা শেষ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল অরূপ। সেটা ভাঙল ঝন ঝন করে।

তারপর বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, এই হারামজাদি, বেরিয়ে আয়! বড় বেশি দেমাক হয়েছে, তাই না? তোর বিষদাঁত কী করে ভাঙতে হয় আমি জানি।

রফিক সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, মাইন্ড ইয়োর ল্যাঙ্গোয়েজ। আমার ধৈর্য শেষ হয়ে যাচ্ছে।

চোপ শালা, বলে রফিককে একটা ধাক্কা দিতে গিয়ে অরূপ নিজেই টলে গিয়ে ধড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে। বেশ জোরে মাথা ঠুকে গেছে।

কয়েক বার উঃ উঃ করার পর সে গলার সুর বদলে ফেলে কাতর ভাবে বলতে লাগল, ভুল, ভুল, সবই ভুল হয়ে গেছে। আর তোমাকে কষ্ট দেবনা নিশা। তুমি নতুন জীবন শুরু কর। শুধু একবার দেখতে দাও তোমাকে। এই পাপী, হতভাগাটাকে তুমি ক্ষমা করো।

তোমার পা ছুঁয়ে ক্ষমা চাইব। সত্যি কথা, এটা আমার অন্তরের কথা। একবার দেখা দাও, নিশা, নিশা-।

কাতরাতে কাতরাতে সে থেমে গেল। উপুড় হয়ে পড়ে রইল সে একটা ধ্বংসস্তূপের মতো।

রফিক একটা জলের বোতল এনে বলল, একটু পানি খেয়ে নিন।

মাথা তুলে অসহায়ের মতো রফিকের দিকে চেয়ে রইল অরূপ। জল পান করল অনেকখানি। বিড় বিড় করে বলল, পাগলামি করছি। সত্যি পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি? আমার হাতটা ধরে তোলো তো রফিক!

রফিক তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।

চোখে যেন কিছু দেখতে পাচ্ছে না, মাথাটা ঝাঁকাল কয়েক বার। তারপর অরূপ বলল, লস্ট কেস! আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়! চলি রফিক, আর কোনও দিন তোমাদের ডিসটার্ব করব না। নিরুদ্দেশের পথিক, সেই-ই ভাল। সে-ই ভাল সে-ই ভাল, আমারে না হয় না জানো- ।

রফিক বলল, গাড়ি এনেছেন? এই অবস্থায় চালাতে পারবেন?

কোনও উত্তর দিল না অরূপ, টলতে টলতে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দরজা খোলা রেখেই বেরিয়ে গেল। রফিক এসে দাঁড়াল সেখানে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে একবার হুড়মুড় করে পড়ে গেল অরূপ। আবার নিজেই উঠে দাঁড়াল। আবার রেলিং ধরে ধরে নেমে, সদরের বাইরে চলে গেল।

রফিক ও নিশার জীবন থেকে সেটাই তার অন্তিম প্রস্থান।

নতুন বছরে সস্ত্রীক বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছে রফিক।

নিশার নাম এখন মেহেরুন্নিসা, ডাকনাম নিশাই আছে। রফিক অবশ্য বলেছিল, ধর্মান্তর গ্রহণের কোনও প্রয়োজন নেই, যে যার নিজের মতো থাকবে। নিশা বলেছিল, ওতে কিছু যায় আসে না, প্রতি দিনের জীবনে কোনও ধর্মীয় আচরণই তো পালন করা হয় না। নামটা বদলে পাসপোর্ট-ভিসার অনেক ঝামেলা এড়ানো গেছে। তাছাড়া শুধু নিশার চেয়ে মেহেরুন্নিসা নামটা তার বেশি পছন্দ, এতে ইতিহাসের গন্ধ পাওয়া যায়।

প্রথম চার দিন কাটাল ঢাকায়। গুলশান আর এলিফ্যান্ট রোডে রফিকের দুই বড় ভাই থাকে, তাছাড়া তার অনেক বন্ধুবান্ধব। সকলের সঙ্গে মিশে যেতে নিশার কোনও অসুবিধে হল না। শুধু দুবেলা নেমন্তন্ন খেতে খেতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার জোগাড়।

অনেকে মিলে দল বেঁধে কক্সবাজারে বেড়াতে যাওয়া হবে, সে-রকম পরিকল্পনা করে রেখেছে রফিকের বন্ধুরা। তার আগে রফিককে একবার যেতে হবে দেশের বাড়িতে, মা আছেন সেখানে। ঢাকা থেকে বেশি দূর নয়।

বেরিয়ে পড়া হল একটা গাড়িতে।

শহর ছাড়িয়ে বাইরে আসার পর নিশা বলল, এটা আমার মা, বাবার দেশ ছিল। ওঁরা কত গল্প বলতেন এখানকার। মা তো এক-একসময় কেঁদেই ফেলতেন। অথচ আমার সেরকম কোনও অনুভূতি হত না। আমার জন্ম জামশেদপুরে। ওখানে আমার বড় মামা থাকতেন।

রফিক বলল, তা হলেও তুমি বাঙাল। এখানকার মাটির সাথে তোমার রক্তের সম্পর্ক!

নিশা বলল, কিন্তু যা-ই বলো, এখানে যা দেখছি, নতুন কিছুই মনে হচ্ছে না। একই তো রকম। তবু মা অত হা-হুতাশ করতেন কেন বুঝি না। কতবার বলতেন, তোরা হতভাগ্য, পৈতৃক ভিটেটাও দেখতে পেলি না। কী সুন্দর বাগান ছিল, কত বড় নদী! আচ্ছা বলো তো, পশ্চিমবাংলায় কি বাগান নেই, নদী নেই?

তবু নিজস্ব বাগান আর অন্যের বাগান কি এক হয়?

নদীটা তো আর নিজস্ব নয়। মামার বাড়িতে বাগান ছিল জামশেদপুরে। সুবর্ণরেখা নদী আছে। খুব সুন্দর নদী!

তোমার দেখছি ওই দিকটাই বেশি পছন্দ।

বাঃ, আমি যেখানে জন্মেছি, সে-জায়গার ওপর আমার বেশি টান থাকবেনা? আমার মা এখানে জন্মেছেন, মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁদতেন। আমার সে-রকম ফিলিং হয় না, আমি কী করব?

ইতিহাসে বহু মানুষ বার বার জায়গা বদলেছে, দেশ বদলেছে। আমি যেমন জন্মেছি বাংলাদেশে, এখন হয়ে গেছি মার্কিন দেশের নাগরিক। কিন্তু ইচ্ছের বিরুদ্ধে যদি দেশত্যাগ করতে হয়, কেউ তাড়িয়ে দেয়, সে-অপমান আর দুঃখ কখনও ভোলা যায় না। যেমন হয়েছিল হিটলারের জার্মানিতে। আমাদের দেশভাগও তো সেই রকম, দুই দিকেই তো কত অসংখ্য পরিবারকে ভিটে-মাটি ছেড়ে পালাতে হয়েছে। তোমাদের বাড়ি ছিল কোথায়?

বিশেষ কিছুই জানি না। শুধু নরসিংদি এই নামটা মনে আছে।

আমাদের গ্রামও তো নরসিংদি'র কাছেই। খোঁজ করা যেতে পারে।

কত কাল আগেকার কথা। বাবা-মা চলে গিয়েছিলেন পঁয়ষট্টি সালে। এখন আর তাদের কথা কে মনে রাখবে?

পুরনো আমলের লোক তো কিছু কিছু আছে এখনও।

আমার জন্মের আগের সব কিছুকেই মান্ধাতার আমল মনে হয়।

নরসিংদি গঞ্জ মতো শহর, প্রচুর মানুষ। সেখান থেকে রফিকদের গ্রাম রসুলপুরের রাস্তা মোটেই ভাল নয়। কিছুদূর পর একেবারে কাঁচা রাস্তা। কোনও রকমে গাড়ি চলে। ধানখেত, পুকুরপাড় দিয়ে যেতে হয় এঁকেবেঁকে। এক জায়গায় একটা ছোট খালের ওপর বাঁশের সাঁকোর কাছে গাড়িটা থেমে গেল। এরপর হাঁটা ছাড়া উপায় নেই।

নিশা জীবনে এই প্রথম বাঁশের সাঁকোয় উঠল।

দুটো বাঁশ পাতা, এক পাশে ধরার ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু সাঁকোটা খুব দোলে। একেবারে শহুরে মেয়ের মতো নিশা ভয়ে চাঁচাতে লাগল।

রফিক ইচ্ছে করে আরও দোলাতে লাগল সাঁকোটা।

নিশা বলল, তোমরা এখানে একটা ব্রিজ বানিয়ে দিতে পারো না? তোমার দাদারা তো বেশ বড়লোক দেখলাম। তুমিও ডলারে রোজগার করো।

রফিক বলল, গ্রামে আর কে থাকে এখন? আমার ভাইরা এত কাছে থাকেন, তবু আসতে চান না। যত দিন মা আছেন...।

সাঁকো থেকে নেমে রফিক বলল, নিশা, তোমাকে একটা অনুরোধ আছে। আমার আম্মার বয়স হয়েছে, কখন কীরকম ব্যবহার করেন ঠিক নেই। দু'বার আমার বিয়ে ঠিক করেছিলেন, আমি রাজি হইনি। তোমাকে দেখে প্রথমটায় যদি উলটো-পালটা কিছু বলেন, তুমি প্লিজ মেনে নিও। পরে ঠিক হয়ে যাবেন, সে-বিষয়ে আমি শিওর।

রফিকদের বাড়িটা ছবির মতো। একটা পুকুর ঘিরে কত রকম গাছ, এক পাশে একটা সাদা রঙের এক তলা বাড়ি। উঠোনে ধানের গোলা।

দেখলেই মনে হয়, এই রকম বাড়িতে শান্তি আছে, এখানেই সারা জীবন থাকি! তবু মানুষ এসব ছেড়ে শহরের ভিড়, ধুলো, ধোঁয়া, বিকট শব্দ পছন্দ করে।

রফিকের মায়ের সামনে যাবার আগে নিশার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। উলটো-পালটা ব্যবহার মানে কী, গালমন্দ করবেন? পছন্দ করবেন না হিন্দু বলে? কিন্তু নিশা তো আর হিন্দু নেই।

একটা ছোট্ট মোড়ার ওপর বসে আছেন মা। প্রথম দেখেই দারুণ চমকে গেল নিশা। ঠিক যেন তার নিজের মা!

সাদা শাড়ি পরা, একটু ভারি শরীর, মাথার চুল কাঁচা-পাকা, গায়ের রঙ ফর্সা টুকটুকে। নিজের মায়ের অবিকল এই চেহারাটাই মনে আছে নিশার। একটু যেন বয়স বেড়েছে।

মানুষে মানুষে এমন মিল হয়!

এ-রকম কথা মনে হলেও তক্ষুনি বলতে নেই। আবেগ দমন করল নিশা। মাথায় আগেই ঘোমটা দিয়েছিল, হাঁটু গেড়ে বসে ফতিমা বিবির পা দুটি ছুঁয়ে বলল, মা, আমি মেহেরুন্নিসা, আপনার কাছে দোয়া চাইতে এসেছি।

ফতিমা বিবি নিশার মাথায় হাত রেখে বললেন, এসো মা, এসো। আশীর্বাদ করছি, ধনে-পুত্রে সুখী হও! কী সুন্দর লক্ষ্মীশ্রী তোমার মুখে, ঘর আলো করে থাকো।

নিশার জন্য আর একটা চমক অপেক্ষা করে ছিল।

পরদিন নিশাকে নদী দেখাতে নিয়ে গেল রফিক। এখানে মেঘনা নদীর রূপ অপূর্ব। নিশা সুবর্ণরেখা নদীর প্রশংসা করেছে, একবার তুলনা করে দেখুক তো!

কোনও নদীর সঙ্গেই কোনও নদীর তুলনা চলে না। সুবর্ণরেখার পটভূমিকায় পাহাড় আছে, তা এখানে নেই। আবার মেঘনা নদীতে এত অসংখ্য নৌকো, এর রূপ অন্য রকম।

একটা নৌকোয় চেপে ঘুরতে ঘুরতে খানিক বাদে চোখে পড়ল একটা পরিত্যক্ত বাড়ি। সামনের বাগান জঙ্গল হয়ে গেছে। দরজা-জানলা ভাঙা, শুধু খাড়া হয়ে আছে কাঠামোটা।

রফিক বলল, এলাটা নিশ্চয়ই কোনও হিন্দু বাড়ি ছিল। নিশা কিছু না বলে শুধু তাকিয়ে রইল সে-দিকে।

রফিক কৌতুক করে বলল, এমন হতে পারে, এটাই ছিল তোমাদের বাড়ি!

নিশা কোনও রকম উৎসাহ দেখালো না।

রফিক নৌকোর মাঝিদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। তার অনুমান ঠিক, এক জন বুড়ো মাঝি জানে, ওটা ছিল দত্তবাবুদের বাড়ি।

রফিক জিজ্ঞেস করল, নিশা, তোমার বাবার পদবী কি দত্ত ছিল?

নিশা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল।

রফিক উত্তেজিত হয়ে বলল, তবে? দত্তদের বাড়ি! তোমাদের সেই বাড়ি!

নিশা বলল, যাঃ, এতটা মিল হয় নাকি? আরও কত দত্ত থাকতে পারে!

রফিক তবু বলল, তবু গিয়ে দেখা যাক। যদি কারুর নাম লেখা-টেখা থাকে। তোমার নিজের বাড়িতে পা দেবে।

মাঝিদের সে বলল সেই বাড়িটার ঘাটের দিকে যেতে।

কেন যেন নিশার মুখখানা লাল হয়ে গেছে। চোখ দুটো বেশি উজ্জ্বল।

সে রফিকের হাত চেপে ধরে বলল, না, ওখানে যাবার দরকার নেই।

রফিক বলল, কেন? দেখতে ইচ্ছে করছে না?

নিশা বলল, আমি মিলিয়ে দেখতে চাই না। কোনও দরকার নেই। আমি তো তোমার কাছে এসেছি। তোমার বাড়িতে। আমি সবটা অতীত মুছে ফেলতে চাই।

একটু থেমে সে খুব নরম কাতরতার সঙ্গে বলল, তুমি আমার কাছ থেকে দূরে চলে যেও না কখনও।